জীবন-সংগ্রাম

শ্রীযতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত

কমলা বুক ডিপো
১৫, বঙ্কিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট,
কলকাতা

—প্রকাশ করেছেন—
'কমলা বুক ডিপোর' পক্ষ থেকে
শ্রীসরোজনাথ সরকার, এম. এ., বি. এল
১৫, বঙ্কিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলকাতা।

—প্রচ্ছদ-পটের ছবি এঁকেছেন—
শিল্পী—শ্রীলক্ষ্মী দাস,
বিবেকানন্দ আর্ট সেণ্টার
৮৪-এ, বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা

—ছেপেছেন—
'শ্রীপতি প্রেসের' পক্ষ থেকে
শ্রীবিভূতিভূষণ বিশ্বাস।
১৪, ডি, এল, রায়, ষ্ট্রীট, কলকাতা

—বেঁধেছেন—
এন্, আই ব্রাদার্স
২, কালী সোম ষ্ট্রীট
মির্জ্জাপুর, কলকাতা

প্রথম সংস্করণ
কার্ত্তিক—১৩৫৬

মূল্য—আড়াই টাকা

জীবন-সংগ্রাম

এক

শেষ রাত্রির আবছা আলো অন্ধকারের সমারোহ। করপোরেশনের উড়ে কুলিরা জলের পাইপ ঘাড়ে করে রাস্তায় এই মাত্র জল দিতে সুরু করেছে। ডিপো থেকে ট্রামগুলো রাস্তায় বেরিয়ে পরবার জন্য দম নিচ্ছে যেন মুখোমুখী দাঁড়িয়ে। কলকাতার [redacted] [redacted] দেশবন্ধু পার্কের নূতন বাড়ীগুলোর মুখ চেয়ে, প্রভাতের প্রথম সূর্য্য উঠছে যেন একখানি প্রকাণ্ড সোণার থালা। তারপর তা থেকে, আলোর জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হয়ে, তাই ছড়িয়ে পড়তে লাগলো সব ঘুমন্তদের বাড়ীর পূব জানালার পথ বেয়ে। সাইকেলে চড়ে খবরের কাগজের হকার বাড়ীতে বাড়ীতে সব কাগজ বিলি করে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে নিস্তব্ধ-ঘুমন্ত সহর যেন জেগে উঠতে লাগলো প্রভাতের প্রথম ব্যস্ততায়। ক্রমে ক্রমে ট্যাক্সি, রিক্সা, ট্রাম, বাস, আর প্রাইভেট মোটরের কোলাহল মুখরতা যেন স্পষ্টতর হয়ে উঠলো।

ঘুম শেষের প্রভাতী শৈথিল্য নিয়ে বিলাস তখনো জেগে ঘুমুচ্ছে। তার মুখের ওপরে এসে পড়েছে প্রভাত সূর্য্যের প্রথম আলো।

জীবন-সংগ্রাম

মাধবী ইতিপূর্ব্বেই শিশুপুত্রটিকে ঘুম থেকে তুলেছিল। এবার সে তাকে হাত মুখ ধুইয়ে প্যাণ্ট্ আর হাপসার্ট পরিয়ে পাঠিয়ে দিল বিলাসকে ঘুম থেকে ডেকে তোলবার জন্য।

পাঁচ বছরের ছেলে অরুণ, বিলাসের গলাটি জড়িয়ে ধরে ব্যতিব্যস্ত ভাবে ডাকছিল,—"বাবা! বাবা গো! শীগগির উঠে পড় না! নইলে কিন্তু তোমার চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। বাবা?—বাবা!"

চোখ রগড়াতে রগড়াতে বিলাস ছেলের ডাকে, ঘুম থেকে জেগেই ছেলের গালে একটু চুমো খেয়ে উঠে পড়লো বিছানা থেকে।

চায়ের পাট শেষ করে বিলাস ছেলেকে নিয়ে চেয়ারে গিয়ে বোসলো। তারপর হুকুম করলো 'চয়নীকা' নিয়ে আসতে।

নাচতে নাচতে মহা আনন্দে অরুণ 'চয়নীকা' নিয়ে এসেই পড়তে সুরু কোরলো ঃ—

"আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে—
প্রভাত পাখীর গান
জানি না কেন রে এতদিন পরে
নাচিয়া উঠিল প্রাণ"

"ওটা-তো তোমার মুখস্ত হয়ে গেছে বাবা! ওটা নয়।

সেইটে বল দেখি? বলেই বিলাস ছেলের মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

মুখ কাঁচুমাচু করে অরুণ বোল্‌ল,—"আমার মুখস্ত হয় নি সেটা বাবা! কি করে তাহলে বোলবো আমি?"

—"বেশ তবে আজকে ঐটেই মুখস্ত ক'র, আমি কাল ভোরে শুনবো।"

—"তবে আমি এখন থেকে পড়তে সুরু করি? কিন্তু সবটা যদি বল্‌তে না পারি কালকে—তবে তুমি বোকবে না বাবা?"

—"না—না বকবো কেন?—তুমি পড় না, কাল না বলতে পারো পরশু বল্‌বে। কেমন এই কথা তো, তবে এবার আমি নাইতে যাই তুমি পড়?"

অরুণ পড়তে সুরু কোরলো:—

"পারে না বহিতে নদী জলধার
মাঠে মাঠে ধান ধরে নাকো আর
ডাকিছে দোয়েল গাইছে কোয়েল
তোমার কানন সভাতে
মাঝখানে তুমি দাঁড়ায়ে জননী
শারদ কালের প্রভাতে।"...

বিলাসের ছোট সংসার। দোতলার একটী ছোট ফ্ল্যাট্। আসবাব পত্রগুলো বেশ সাজানো গোছানো। বড় ঘর খানিতে এক পাশে একখানা খাট তার ওপাশেই একটা ছোট্ট টেবিলের তিন দিকে খান কয়েক চেয়ার। একটু দূরে

জলচৌকির ওপরে একটা সেলায়ের কল, তার পাশেই একটা অরগ্যান হারমোনিয়ম। দেয়ালে সব ভালো ভালো প্রাকৃতিক ছবি। মাঝে মাঝে কোথাও বা রবীন্দ্রনাথের হাপবাষ্ট্, কোথাও বা বিবেকানন্দের তেজোদীপ্ত ছবি। টেবিলের ওপরে একটা এলার্ম টাইম পিস্ ঘড়ি—অকাতরে সময়ের তাগিদ দিয়ে যাচ্ছে। বেলা তখন সোয়া ন'টা।

বিলাসের আহারাদি ততক্ষণে শেষ হয়ে গেছে, অফিসে যাবার জন্য জামা যুতো পরে সে তখন প্রস্তুত। মাধবী এসে পাশে দাঁড়ালো। অরুণ এসে দাঁড়ালো মায়ের আঁচল ধরে—বিলাসের মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে! হাত ধরে পাশে টেনে নিয়ে বিলাস ছেলেকে চুমো খেয়ে সোহাগ কোরলো; তারপর মাধবীর দিকে চেয়ে এক গাল হাসি হেসেই সে ঘর থেকে চট্‌পট সিঁড়ি দিয়ে নেমে পথে বেরিয়ে পড়লো।

চাকরীর তাগাদা যে একটা মানুষকে কেমন উল্কার মত ছুটিয়ে নিতে পারে, গাড়ীবারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখছিল আর ভাবছিল মাধবী দেবী অনেকক্ষণ ধরে।

* * * *

কর্ম্মস্থল মাড়োয়ারীর গদিতে বিলাস যখন গিয়ে ঢুকলো তখন বেলা সোয়া দশটা। স্থানটী যে বিচিত্র তাতে সন্দেহ নেই।

প্রকাণ্ড হ'ল ঘরের ভেতরে ঢালা বিছানা। কক্ষের মেঝেতে সামনের প্রায় অর্দ্ধেকটা, বড় একখানা ফুল পাতা লতা বাহার রাবার ক্লথে মোড়া। গদির সীমানা গিয়ে পৌছেচে প্রায় দেয়ালের গা পর্য্যন্ত। কর্ম্মচারীদের প্রত্যেকের পাশেই একটি করে মেহগণি পলিশ কাঠের হাত বাক্স; কারো কারো পাশে ছোট এক একটা আয়রণ-চেষ্ট্; আর সবাইকার সামনেই বসে লিখবার জন্য একটা করে জলচৌকী। কর্ম্মচারী বিশেষের পেছনে এক একটি উঁচু তাকিয়া।

পেছনের দেয়ালের প্রায় অর্দ্ধেকটাই মার্ব্বেল করা ফুল পাতা লতার দেয়াল ছবি। আর ঠিক তার ওপরেই প্রায় তিন দিকের দেয়ালময় নানা রকমের দেব দেবীর ছবি। কোথাও রাজারাম, কোথাও কমলে কামিনী, কোথাও বা হনুমানের প্রণামরত রামসীতার বিরাট ছবি;—আর তারই মাঝে মাঝে ফার্ম্মের সত্যাধীকারীর বাপ্-পিতামহের বড় বড় তৈল চিত্র। হল ঘরটির ঠিক মাঝখানের কড়িকাঠে একটা বিরাট বৈদ্যুতিক পাখা বোঁ বোঁ করে ঘুরছে। দেয়ালের ঠিক্ মাঝখানটিতে একটা বড় দেয়াল ঘড়ি। ঘড়ির তলার আসনটাতে বসেই বিলাস রোজ কাজ করে, আর তার পাশেই একটি তাকিয়া হেলান দিয়ে বসে,—আলবোলায় তামাক সেবন করেন সেই ফার্ম্মের সত্যাধিকারী। পরিধানে তার চোগা আর চাপ্কান; মাথায় একটা সৌখীন নয়ানসুখ কাপড়ের জড়ানো পাগড়ী।

কিসের যে কারবার এখানে হয় আর কিসের হয় না সে কথা বলা শক্ত। তবে লোক আসে প্রচুর! বাঙ্গালী, মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, সিন্ধিয়া তো আছেই—তার ওপরে সাহেব সুবোও বাদ যায় না। মাল ডেলিভারী হচ্ছে কো'নটা পোর্ট কমিশনারের জেটী থেকে, কো'নটা হচ্ছে—আলু পোস্তা থেকে, কো'নটা হাওড়া ষ্টেশন অথবা শিয়ালদা থেকে। কিন্তু টাকা এসে জমা পড়ছে শুধু এই গদিতে। দশটাকা আর একশো টাকার তাড়া তাড়া নোট।

এমনি কর্ম্মব্যস্ততার শেষ হয়ে আসে প্রায় সন্ধ্যা হবার মুখে। দিনের কাজ শেষ করে বিলাস সবে গাত্রোত্থান করবে মনস্থ করছে, এমনি সময়ে মাড়োয়ারী বাবু বিলাসের কানের কাছে মুখটা এগিয়ে নিয়ে বললেন—"চাউর কা কারবার মে তো বহুৎ গলৎ-আ গিয়া বাবু সাব্! আদমী লোগোন্‌কো এক এক করকে সব লোটিশ দে দি জিয়ে।" কর্ত্তার কথা শুনে তো বিলাসের মুখ চুন আর কি! তবুও সে প্রশ্ন কোরলো, "কেয়া গলদ আ-গিয়া বাবু সাব্?"

—"গলৎ কো বাত্ আপকো কেয়া সমঝায় গা? লেখা-পড়ি আপ্ তো সব কুছ জান্‌তাই হ্যায়! লোকসান কো কারবার আউর হাম্ চালানে নেই মাংতা!"

কারবারের কথা জানা না জানায় বিলাসের কিছুই আসে যায় না। সে যেখানে চাকর সেখানে চাকরীটাই তার বড়

কথা। তবুও সে একবার বোল্‌ল—"তব হাম-লোক্‌কো কেয়া হাল্‌ হোগা বাবু সাব ?"

মাড়োয়ারীবাবু বিলাসের কথায় মুখ ব্যাদান করে বললেন,—"আপ্‌কো কেয়া হরজা ?—কৈ আল্‌দা আফিস মে ফিন্‌ একঠো নকড়ি লে লি জিয়ে ! আপ্‌ এত্‌না লিখ্যা পড়ি কিয়া, কৈ একঠো অফিস্‌মে ফিন্‌ একঠো নক্‌ড়ি লেনে নেই শেখেগা ?"

সমস্যা গভীর ! এর পর যে আর নিজেকে ছোট করে লাভ কিছুই হবে না, সে কথা বিলাস মনে মনেই উপলব্ধি কোরলো। তারপর বোললো,—"তব্‌ বলিয়ে, হাম্‌কো আভি কেয়া করনে হোগা ?" বিলাসের কথার জবাবে মাড়োয়ারী বাবু বললেন,—"আপ এক কাম কি জিয়ে। কাল ফজিরমে একদফে ইধার আ জাইয়ে। যো দশ আদ্‌মি আপসে তন্‌খা লেতা, উন্‌ লোকোনকো পন্দর পন্দর রোজ্‌কা তন্‌খা জেয়াদা দে কর্‌, নকড়ি খতম কর্‌ দি জিয়ে !" এ কথার পর গদিতে কাল বিলম্ব করা বিলাসের পক্ষে আর মোটেই সম্ভব হয় নি।

দুই

নিস্তব্ধ দুপুর। পাশের বিছানায় ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে মাধবী তার শেলাইএর কলটা নিয়ে ঘরের মেঝেতে বসে স্বামীর জন্য একটা ফতুয়া তৈরী করছিল। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে মনে মনেই সে গুন্ গুনিয়ে গাইছিল

গান

তুমি কখন আসবে তাতো
নাহি জানি।
তবু যে গো তারি লাগি,
রোজ নিরালে একলা জাগি,
তোমার নামে জড়িয়ে মোরে
বাতাস করে কানাকানি ;
কোথায় দূরে কোকিল ডাকে
কানন তলে,
প্রাণের কূলে মাতন লাগে ;—
পলে পলে ;
ছায়ার মত দিনের শেষে
কখন এসে উঠবে হেসে,
তারি লাগি একলা প্রিয়
গানের সুরে মিলাই বাণী।

দোতলার যে ঘরটিতে মাধবী বসে শেলাই করছিল, সেই ঘরের সামনের গাড়ীবারান্দার তলা দিয়ে, বাসনওয়ালা, কাটা

কাপড়, চিনেবাদাম বিক্রেতারা, স্বপ্নাদ্য মাদুলীওয়ালারা সব হেঁকে যাচ্ছিল ব্যবসায়ের নানা জিনিষের রকমারী নাম ডাকতে ডাকতে। স্তব্ধ দুপুরের নিস্তব্ধতা যেন কেঁপে কেঁপে উঠছিল তাদের রকমারী সুরের কর্কশতায়।

সেলাইয়ের একটা জোড় দাঁতে কাটতে কাটতে মাধবী কাপড়টাকে ঘুরিয়ে সেলাই করতে গিয়েই, দু হাত মেসিন চালিয়ে বুঝতে পারলো, ববিনের সূতো ফুরিয়েছে।

নূতন করে সূতো ভরে নিয়ে, সেটাকে আবার মেসিনে ভরে ঠিক করে নেবার সময়, ওপর তলা থেকে বাড়ীওয়ালার স্ত্রী মিনতী দেবী এসে মাধবীর কক্ষে প্রবেশ করলো। হাতে একটুকরো কাটা কাপড়। কক্ষে প্রবেশ করেই বললো,—"দিদি যে বড্ড ব্যস্ত দেখতে পাচ্ছি?"

কল চালাতে চালাতেই মাধবী উত্তর দিলে,—"কি আর করি বলুন না? আপনার মতো বড় মানুষ তো নই, কাঁহাতক আর রেডিমেড্ জিনিষ কিনে সংসার চালাই?"

দেমাকের ভঙ্গীতে, চোখে দুষ্ট হাসি হেসে, মিনতী বলে,—বড়লোক, না ছাই? কোন জম্মে দেখুন না কর্ত্তা আমার বালীগঞ্জে প্লট কিনে রেখেছেন, তাতে বাড়ী কি আর উঠলো আজ অবধি? ওঁর নিজেরই হাত খরচা মাসে দু'শো টাকা! তারপর ঐ যে মিনাটিকে দেখছেন—? ওটী হচ্ছেন ওর আর একটি খরচের ডিপো! বই, খাতা, পোষাক আসাকের কথা না হয় বাদই দিলুম। ওই মেয়ের হাত খরচ হচ্ছে দিনে

পাঁচ টাকা! আর দেখুন তো আমার খরচ? দিনে পান দোক্তার জন্য মোটে আট গণ্ডা পয়সা!"

মুচকী হেসে মাধবী উত্তর দেয়—"আপনার কর্ত্তা তাহলে বড় সোজা টাকা রোজগার করেন না? হাজার টাকার চাইতেও ঢের বেশী—কি বলুন?"

—"তা হলে কি হবে ভাই! এই তো দেখুন ও মাসে চাইলুম একটা বিছে হার; তা বল্‌লেন,—এখন সোণার ভরি নব্বই টাকা করে। এত দামের সোণায় কি গয়না গড়ানো চলে? বলুন তো ভাই আপনি—নব্বই টাকাই হোক আর ন'শো টাকাই হোক থাকবে তো সব তোমারি? আমি ক'দিন ই বা বাঁচবো? গতরটা যে রকম অনড় হয়েছে কখন কি হয় কে জানে! সামান্য একটা সখ বইতো নয়?"

মাধবী, এই অবুঝ মুখরা মেয়েমানুষটিকে রীতিমত ভয় করে! এর মূঢ়তা এবং অহঙ্কার এমনি অসহনীয় যে তা আর বললে ফুরোয় না। কাজেই তাকে পাশ কাটানোই সে সব চাইতে বেশী পছন্দ করে! ভয়ে ভয়ে মাধবী বলে ওঠে—"গলায় তো আপনার ভালো সোণার হারই রয়েছে দেখছি? আর কি দরকার?" তারপরেই সে প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে প্রশ্ন করে—"ও কাপড় টুকু কেন এনেছেন বলুন না?"

মিনতী সহসা উত্তর দেয়,—"শুধু কি হার এই একটা? এ রকম তো দশ পনেরোটা হার আমার রয়েইছে! এই ধরুন একটা মটর মালা,—একটা চন্দ্রহার,—একটা মফ্‌চেন;—কে'ন

মিনা বুঝি আপনাকে বলেনি ?" তারপর একটু থেমে বলে—"কিন্তু তা থাকলে কি হবে ভাই, নতুনের একটা সখ, সে হোল অন্য কথা।" একটু দম নিয়ে তারপরে বললে,—"এই কাপড় টুকুর দুধারে দুটো সেলাই দিয়ে নেবার জন্যেই আমি এসেছি ভাই! মিনাকে অত করে বল্লুম,—ছুঁড়ি কিছুতেই দিলে না সেলাই করে! কেবলি ওর সময় নেই শুনতে শুনতে আমার কান ঝালাপালা হয়ে গেল!"

মুচকি হেসে মাধবী বলে,—"কি হবে ওটা সেলাই করে ?"

ঠাট্টার ভঙ্গীতে চোখ পাকিয়ে, মিনতী জবাব দেয়,—"মাথার বালিশের ওয়াড় গো ঠাক্‌রুণ! তখনই বল্লুম মিনাকে, দিসনে বাপু তুই সবগুলো বালিশের ওয়াড় ধোপাকে। সে কি শুন্‌লে ছাই ? দুটো বালিশের দু'ডজন ওয়াড় ও ধরে তুলে দিলে ধোপার হাতে! শুধু বালিশের ওপরে তোয়ালে ঢাকা দিয়ে, আমার কেমন যেন বড্ড দিকসিক্ লাগে ভাই শুতে। বাক্সে পড়েই ছিল এ কাপড় টা—তাতেই ভাবলুম নিয়ে যাই দিদির কাছে, দুটো সেলাই দিয়ে আনি।" তারপর প্যান চিবুতে চিবুতে পা ছড়িয়ে বসে বললে,—"কর্ত্তার যত সব কাণ্ড! শুধু শুধু কিনে আনলেন একটা সেলাইয়ের কল! মিনা কচিৎ কখনো ব্লাউজ পেটিকোট এক আধটা সেলাই করে; নইলে তো পড়ে পড়েই মেসিনটা মর্‌চে ধরবার উপক্রম হোত! আমার ভাই আবার ও সব পোষায় না। বাপের ঘরে ছিলুম, কোনদিন কুটোটি নেড়ে আমাদের খেতে হয় নি।

বাঁধা দরজী ছিল, বাঁধা সব জামা কাপড়ের দোকান। মাসে মাসে বাবা তাদের সব মাইনে দিতেন। তা ছাড়া জিনিষের দাম তো সঙ্গে সঙ্গেই দিয়ে দিতেন। 'দরজী'—? মুখ থেকে বেরুবার অপেক্ষা রাখতো না—অমনি এসে দোর গোড়ায় হাজির। একটার যদি দরকার হোত, তো অর্ডার দিয়ে দিতুম দশ, বিশটার! ব্লাউজ, পেটীকোট, আর টাইট-ব্রেষ্টের অভাব আমাদের ছিল না কোন কালে;—সে খানে বালিশের ওয়াড় আবার একটা জিনিষ? কি সংসারেই পড়েছি! সত্যিই মনে পড়লে হাসি পায়! আমায় কিনা উনি শেখাবেন সেলাইয়ের কাজ! আমার বয়ে গেছে মেসিন চালিয়ে সেলাই করতে!"

এমনি সময়ে রাস্তা থেকে হাঁক শোনা গেল—"বাসন নেবে গো?" মিনতী সসব্যস্তে মাধবীর গাড়ী বারান্দার রেলিংয়ের ওপর থেকে ঝুঁকে পড়ে বাসনওয়ালীকে ডেকে বললেন,—"উপরে একবারটি এসো গো!"

উপরে এসে বাসনওয়ালী তার বেসাত নামিয়ে ভালো ভালো কাপ-ডিস্—প্লেট আর কাচের গ্লাসগুলো একটি একটি করে সাজাতে সুরু কোরলো।

মিনতী দেবী ততক্ষণে এক জোড়া কাপডিস আর একটা গ্লাস্ ছোঁ মেরে তুলে নিয়েই তার দাম জিজ্ঞেস কোরলো,—"কখানা ছেঁড়া ন্যাকড়া পেলে সে এগুলো দিয়ে যেতে পারে?"

প্রশ্নের জবাবে, বাসনওয়ালী বল্‌লে,—"ন্যাকড়ায় কি আর

আজকাল বাসন কাপ-ডিস্ হয় মা ?—কাপড় দিতে হবে ! অবিশ্যি পুরনো কাপড়ই দেবেন মা ; মাঝে মধ্যে এক আধ-টুকু ছেঁড়া থাকলেও চলবে ! কিন্তু পুরো কাপড়টা থাকা চাই। টুকরো ন্যাকড়া হলে তো চলবে না—মা !"

এক যোড়া কাপ-ডিস্ আর একটী বাটী দেখিয়ে মাধবী প্রশ্ন করে—"এর জন্য কি দিতে হবে বল দেখি ?"

হাত মুখ ঘুরিয়ে বাসনওয়ালী বলে—"চার খানা কাপড় দিন মা আর কি বোলব ?" বাসনওয়ালীর কথায়, নিজের গালে একটা চড় খেয়ে মিনতী হাতের বাসনগুলো মেঝেতে নামিয়ে মাধবীর দিকে চেয়ে বোললো,—"শুনলেন দিদি বাসনওয়ালীর কথা ? ঐ কটা জিনিষের জন্যে ওকে চার চার খানা পুরনো কাপড় দিতে হবে। সে কাপড়ের আবার রকমটা শুনলেন তো ?—কালে কালে এ সব হোল কি দিদি ?"

মাধবী অত্যন্ত নিস্পৃহ ভাবে মিনতীকে লক্ষ করে বললো,—"থাকগে, তবে আমার দরকার নেই দিদি।"

মিনতী প্রায় চেঁচিয়ে উঠে বাসনওয়ালীকে উদ্দেশ্য করে বললে,—"কালে কালে তোমাদের সব হচ্ছে কি বলতে পারো ? যে রকমের কাপড় তুমি চাইছ ও রকমের চারখানা কাপড় দিলে কটা কাপ-ডিস আর ক'ত বাসন পাওয়া যায় তা তুমি জানো ?"

মুখ নেড়ে হাত ঘুরিয়ে বাসনওয়ালী বলে—"খুব জানি মা খুব জানি। এই কাজ করে খাই আর আমরা জানিনে ?

চারখানা কাপড়ে আগে যা পাওয়া যেত, আজকাল তা মেলেনা মা দু'খানা কাপড়েও।"

মিনতী খেঁকিয়ে উঠলো,—"হ্যাঁ তোমাকে বলেছে—মেলেনা বৈকি? এই তো সেদিন এক বাসনওয়ালী এসেছিল, বললুম একখানা ছেঁড়া কাপড় পাবে, কি বাসন দেবে বলো? সে হাতে তুলে দিয়ে গেল এক জোড়া কাপ-ডিস্ একখানা ভাল প্লেট একটা দামী গেলাস—"

দু'পা এগিয়ে এসে মিনতী দেবীর কাছে দু'খানি হাত মেলে বাসনওয়ালী বললে,—"আমি হাত পেতে রয়েছি মা? একবার যদি নিয়ে এসে সেগুলো আমাকে দেখাতে পারেন,—তা হলে মা আমার এই সব বাসন আপনাকে অমনি দিয়ে যাবো—!"

অপ্রস্তুত মিনতী সে কথার আর কোন উত্তর না দিয়ে, বাসনওয়ালীকে পাশ কাটিয়ে ওপরে উঠবার পথে বলে চললো, —"অমনি দিয়ে যাবো? কি আমার দানবীর এয়েছেন গো?"

বাসনওয়ালীর কথার উচ্ছাস তখন চরমে উঠেছে। মাধবীকেই উদ্দেশ্য করে সে তখন বলতে লাগলো,—"কি রকমের সব অন্যায় কথা মা শুনলেন তো? ছেঁড়া কাপড়ের পরিমাণের বহরটাই উনি দেখলেন,—বাজারটার কথা আর একবারটিও ভাবলেন না! দু'টাকার কমে চুনো পুঁটী মাছ মেলেনা। সাড়ে ষোল টাকা মনের র‍্যাসানের চাল,—তার না আছে জাতের ঠিক না আছে কিছু—, তার কোনটা যে বালাম, বাকতুলসী, সিতেশাল, আর কোনটা যে চামড়মনি, তার কোন

ঠিক নেই! অৰ্দ্ধেক কাঁকর আর অৰ্দ্ধেক তার পাথরে ভৰ্ত্তি। এই দুর্মূল্যের জিনিষ কিনে সাধ্য কি মা আমাদের পেট চালাই?"

মাধবী দেবী আগাগোড়া ঘটনাটীকে মিটিয়ে দেবার জন্য বাসনওয়ালীকে বোললে—"হ্যাঁ তাতো সত্যিই? যা বাজার পড়েছে সব জিনিষই মাগ্যি, তার তোমরা করবে কি!" তারপর একটা হাই তুলে মাধবী বলে,—"উনি তো চলেই গেলেন, আর আমারও এ সব জিনিষের আজ তেমন দরকার নেই মা!— তা ছাড়া তুমি যে ন্যাকড়ার কথা বললে,—ও আবার খুঁজে আমাকে দেখতে হবে! তুমি বরং অন্য একদিন এসো!"

মাথায় বাসনের ঝুড়ি তুলে বাসনওয়ালী উত্তর দেয়,—"সে কথা হচ্ছে না মা! সে তোমার যেদিন সুবিধে হয় নিও! বাজারের কথা হচ্চিল কি না!—গরীব গরবা আমরাই তো সব মরছি না খেয়ে শুকিয়ে! আইনের খাঁড়া দেখিয়ে যারা মানুষের যথা সৰ্ব্বস্ব লুটে নিয়ে খাচ্ছে, তাদের তো কেউ কিছু আপনারা বোলছেন না? দোষ করলুম বুঝি আমরা? অভাব অভিযোগ তো আর আপনাদের গায়ে লাগে না মা! তা অমনি করে আপনারা বোলবেন বই কি!" তারপর গজ্ গজ্ করতে করতে বাসনওয়ালী নীচে নেমে গেল।

বাসনওয়ালী চলে যেতেই মিনতী দেবী আবার ওপর থেকে তরতড়িয়ে নীচে নেমে এসেই মাধবীকে বলতে সুরু কোরলো,— "আপনি শুনিয়ে দিতে পারলেন না?—ওদের ধরে সব পুলিশে

দেওয়া উচিত!" মাধবী দেবীর তরফ থেকে কোন উচ্চবাচ্য এলো না দেখে মিনতী দেবী একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললো—"আজকাল এমনিই হয়েচে সব! সেদিন মিনাকে উনি একজোড়া জুতো কিনে দিলেন,—ওমা কি ছাই জুতো! তারই দাম নাকি হয়েছে সাড়ে আঠারো টাকা। শুনে আমার গা জ্বলতে লাগলো! সত্যিই এ হোলো কি?"

দাঁতে সেলাই কাটতে কাটতে একটু মুস্কি হেসে, মাধবী দেবী উত্তরে বলে—"আপনার আর তাতে দুঃখ কি দিদি? কর্ত্তার রোজগারে না কুলোয় আপনিও অপিসে গিয়ে কর্ত্তার পাশে বসে পড়বেন! দুজনে মিলে টাকা রোজগার করে আনবেন! দুঃখ্য দুর্দ্দশার সাধ্য কি যে আপনাদের জীবন যাত্রায় ব্যাঘাত ঘটায়?"

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে মিনতী বলে,—"চাকরী করতে যাবো পুরুষ মানুষের গা ঘেঁসাঘেঁসি করে অফিসে? তার চাইতে গলায় দড়ি দেয়া ঢের ভালো!"

মিষ্টি হাসি হাসতে হাসতে মাধবী দেবী বললো,—আহা অন্য পুরুষের গা ঘেঁসতে আপনাকে কে বোলছে! কর্ত্তার গায়ে গা ঘেঁসে চাকরী করবেন তাতেও আপত্তি?"

এমনি সময়ে কলেজ ফির্ত্তি মিনা এসে মাধবীর কক্ষে উঁকী মেরেই বলে উঠলো,—"একেবারে যেন জোড় মাণিক গো দুটিতে। কিসের পরামর্শ হচ্ছে এ'ত শুনি?"

মিনার কথায়, মাধবী হেসে উঠে বললে,—"যত ভাবনা তো

ভাই তোমাকে নিয়েই! কলেজের মেয়েদের আজকাল আর কেন যেন ছেলেরা বিয়ে করতেই চায় না! তাইতো ভেবে মরছি আমরা তোমার ভবিষ্যৎ নিয়ে!"

—"দয়া করে তোমরা আমার ভবিষ্যৎ না ভেবে বরং নিজের নিজের ভবিষ্যৎ ভাবো দেখি—!" বলেই মিনা গট্ গট্ করে উপরে চলে গেল।

কাটা কাপড়ের টুকরোটুকু মেসিনের পাশে রেখে—মিনতীও মিনাকে ডাকতে ডাকতে ওপরে উঠে গেল।

এরা সব চলে যেতেই মাধবীর হুঁস হোলো—ওমা বেলা যে পড়ে এসেছে! এর পর সে,—মেসিন আর সেলাইএর সাজ-সরঞ্জাম তুলে রাখলো। ঘুম থেকে উঠে, ছেলে অরুণ ততক্ষণে দু'হাত দিয়ে চোখ রগড়াচ্ছিল।

*　　*　　*

অফিস ফির্তি বিলাস যখন ঘরে এসে ঢুকলো তখন মাধবীর উনানে চায়ের জল ফুটছে। ছেলে অরুণ টেবিলের কাছে বসে বই পড়ছে।

মাধবী, বিলাসের উদাস গম্ভীর মুখচ্ছবি দেখে চিন্তান্বিত হয়ে প্রশ্ন কোরল—"অমন শুক্নো শুক্নো দেখাচ্ছে কেন? অসুখ বিসুখ কিছু হয়নি তো? রাত্রিতে খাবে কি? র‍্যাশানের আটা তো ফুরিয়েছে। দুটি ভাতই রাঁধবো তো? দেখি একবার গা-টা!" বিলাসের গায়ে হাত ঠেকিয়ে, দূরে

২

গিয়ে স'রে দাঁড়িয়ে মাধবী বললো,—"কি হয়েছে ব'ল দেখি? গা তো দেখছি হিম ঠাণ্ডা!"

মনের অবস্থাটা ইতিপূর্ব্বেই বিলাস সম্পূর্ণ গোপন করে ফেলেছিল। এতক্ষণ সে চিত্রার্পিতের মত মাধবীর কাণ্ড কারখানা দেখে, মিটী মিটী হাসছিল;—এবার বলে উঠলো "এরি মধ্যে পরীক্ষা শেষ! এ রকম হোপলেস্ লেডি ডাক্তার আমার রোগ ধরতে পারবে না! নার্স বরং ভালো—চাইকি এতক্ষণ মাথাটাই টিপতে সুরু করে দিত!"

সামনে দাঁড়িয়ে কোমরে হাত দিয়ে মাধবী বললো,—"নার্স'ই বলো আর ফার্স'ই ব'লো রোগ যে কিছুই ধরতে পারিনি তা মনে কোরনা!—বল্‌তে তোমাকে হবেই—মিছিমিছি খানিকক্ষণ চেপে থাকবে,—এই তো?"—বলেই মাধবী হেঁসেলের দিকে রওনা হোল। বিলাস ততক্ষণে জামা কাপড় ছেড়ে লুঙ্গী পরে গুণ গুণ করে গাইতে সুরু কেরলো।

"গান গাওয়ালে আমায় তুমি
কতই ছলে যে,
কতো সুখের খেলায় কতো
নয়ন জলে হে।
ধরা দিয়ে দাও না ধরা
এসো কাছে পালাও ত্বরা
পরাণ করো ব্যথায় ভরা
পলে পলে হে।"......

তিন

—"মেঝডি বাড়ী আটিস্—ও মেঝডি!" এই বলে ডাক্‌তে ডাক্‌তে ন্যাড়া উঠে এসে মিনতী দেবীর তেতলায় উপস্থিত হোল। অসময়ে ভাইয়ের এই আগমনে মনে মনে মিনতী দেবী তেলে বেগুনে জ্বলে উঠ্‌লো। ভেতরের রাগ অনেকটা চেপে, কথার উত্তর দিতে গিয়ে ভাইকে সে বলে উঠলো,—"তোর কাণ্ডজ্ঞান কি দিন দিনই লোপ পাচ্ছে? কেন এমনি করে একদল ভাড়াটের মধ্যে আমাকে হাসাতে আসিস্ শুনি?"

দিদির কথায় ন্যাড়া থ্য মেরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে, শেষে বলে উঠলো,—"টবে টুই বলে ডে না—বলে ডে! এক্ষুনি টলে ডাচ্ছি! লোক পাটিয়েটিলি—টখন বুঝি মনে ঠিল না? এঁচে পল্লুম কি'না? টাই বুঝি টাড়িয়ে ডিটে টাস?"

লজ্জায়, অপমানে, মিনতীর কর্ণমূল পর্য্যন্ত ততক্ষণে লাল হয়ে উঠেছে। ধমকে সে তখন বলে উঠলো,—"বাইরে থেকে বাঁদরামো গুলো না করে, ঘরে এসে ঐ চেয়ারটায় বোস দিকি! ডেকেছি বলে কি তুই সদর রাস্তা থেকে অসভ্যের মত চেঁচাতে চেঁচাতে বাড়ী ঢুকবি?"

—"আমি আবার চেঁতালুম কোঠায়? টুইটো টেঁচাচ্ছিস! টোকে বড্ড ভালবাসি কিনা? টাই ঠুটে আসি। টাই টুডু-টুডু-টুই আমায় অপমান করিস!"—এই কথা বলেই আধভাঙ্গা গলায় ন্যাড়া ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে সুরু কোরল।

মিনতী দেখলো বেগতিক। তখন সে নানাভাবে মিষ্টি কথায় ভাইকে শান্তনা দিয়ে নিজের কাপড়ের আঁচল দিয়ে ভাইয়ের চোখ মোছাতে সুরু করলো।

ন্যাড়ার আনন্দ তখন আর ধরে না; দাঁত মুখ ব্যাদান করে সে বল্লে—"টবে ড্যাক ডিকি—টুডু টুডু আমাকে বকছিলি যে? নিজে টৌ কৈ ঠাক্‌টে পাল্লিনি? এবার হিসেব করে ড্যাক্‌ ডিকি, টুই আমায় কটো ভালবাসিস? সাধে আর আমি টোর ডন্যে পাগল হই! টুই আমায় ব'ল!—একবারটি বলে ড্যাক্‌ না?—ডেহ মণ্ডার ঠেকে আমার প্রাণটা টোকে বিলিয়ে ডিটে পারি কি না। এক্ষুনি ডেকাবো?—টুই ডেক্‌বি? · ···"

এমনি সময়ে পাশের ঘরের গাড়ীবারান্দা থেকে অরগ্যান হারমোনিয়মে মিনার গান শোনা গেল।

গান

কেন,—পথ ভোলালে পথের মাঝখানে,—
আকুল গানে।
পাগলা হাওয়ার সুরে সুরে
আবেশ যে তার বেড়ায় ঘুরে
প্রেমের ব্যথায় ব্যাকুল হিয়া
হারায় অজানে।
সুরের মোহ কণ্ঠে তোমার
সোহাগে মাখা
বিলায় কি গো?—যেথায় দূরে
চাঁদিনী রাকা!—
চাওয়ার পথে পাইনি দেখা,
মন পেয়েছে তোমায় একা;
এই অজানা মিলন মোদের—
কেহ না জানে।

মিনার গান শুনতে শুনতে ন্যাড়ার মাথা একেবারে গুলিয়ে গেল! তখন কোথায় বা দিদি আর কেবা শোনে তার কথা।

বারে বারেই সে তখন জানালার পর্দ্দা সরিয়ে যতবার মিনার গান শোনবার জন্য কান পাততে চায়, ততবার মিনতী দেবী তাকে তর্জ্জনী দেখিয়ে কৃত্রিম ভৎ´সনার সুরে দাঁত কিড়মিড় করতে থাকে!

মিনার গান শেষ হয়ে গেল। কিন্তু মিনতীর কৃত্রিম বিরক্তিতে ন্যাড়ার মুখ তখন রাগে আর অভিমানে প্রায় বেলুনের আকার ধারণ করেছে!

মিনতী দেবী কলতলা থেকে হাতে মুখে জল দিয়ে কক্ষে প্রবেশ কর্‌লো। মিনা তার গান শেষ করে, সুরের শেষ রেশটুকু গুন্ গুন্ করে গাইতে গাইতে নীচে নামতে সুরু করলো।

সেই দিকে একবার জানালা দিয়ে উঁকী মেরে দেখে, ন্যাড়া মিনতীর পা দুটো সহসা জড়িয়ে ধরে বলে উঠলো,—

—"ডোহাই ডিডি, টুই শুঢু একটুখানি জামাইবাবুকে বলে ডে; শুঢু একবারটী টোর ঠাকুরঝিকে আমি বিয়ে কোরবো! ঐ মেয়েটার জন্যে কতো রাত্তির যে আমি কেঁডেছি, টোকে বল্‌লে ফুরোয় না!"

রাগত গম্ভীর সুরে, চোখ্ পাকিয়ে, মিনতী দেবী ভাইকে শাসনের ভঙ্গিতে বলে উঠলো,—"ছাখ্‌ ন্যাড়া তোর বড্ড বেশী বার্ হয়েছে! লজ্জা করে না তোর এইসব কথা বোলতে?

মিনাকে বিয়ে করবার কথা তুই ভাবতে পারিস কোন্ দুঃসাহসে? কি বিদ্যেবুদ্ধি তোর? তাকে তুই খেতে দিবি কি? নিজে থাকবার নেই ঠাঁই—শঙ্করাকে ডাক্।"

কিন্তু দিদির সে কথায় ন্যাড়া কান না দিয়ে, বলে উঠ্লো,—"টোর মটন এমন একটা হোমড়া টোমড়া ডিডি থাকতে আমার ঠাক্‌বার ডায়গার অভাবটা কি ঠুনি?" তারপর নিজের মাথার এলো চুল আর কণ্ঠনালী চুল্‌কে—এক পাটী দাঁত বের করে, ন্যাড়া হাসতে হাসতে বল্‌লো—"কি রকম গলা টুই একবার লক্ষ করেটিস্? এ বাড়ীতে ঢুকলেই টোর ঠাকুরঝি ঐ গানটী কেন না গেয়ে ঠাকতে না পারে, বল দিকি? পড্‌গুলো টো টুই ঠুনবি না? টুডু টুডু আমার সঙ্গে ডাঁট্ কিড়মিড় করবি! কি রকম পড্‌গুলো—বল্ ডিকি?—

টাওয়ার পঠে পাইনি ড্যাকা,
মন পেয়েটে টোমায় একা,
এই অডানা মিলন মোডের
কেহ না ডানে?—

কটো গভীর প্রেম! টুই লক্ষ করেটিস? টোর পায়ে পড়ি ডিডি, টুই টুটু একটী বার ঐ মেয়েটার ঠঙ্গে—আমার হাটে হাট মিলিয়ে ডিয়ে ড্যাক্—ওকে নিয়ে আমি কি রকম একটা ফিল্মের ঠবি টুলি? টুই টো জানিস্ না ডিডি, মেণ্টাল হাসপাটালের বিষ্টুডা আমায় কি বোলেটে ডানিস—?—বলেটে

মাত্র তিন মাস হাসপাটালে ট্রেনিং নিলেই লেডি ডাক্তার হয়ে উঠবে। সহর মাট্—হয়ে যাবে!” তারপর আধ ভাঙ্গা গলায়—ফিস্ ফিস্ করে, কথা বলার ভঙ্গিতে ন্যাড়া মিনতীকে বোল্‌লো,—“একটীবার টুই শুটু ঐ মেয়েটাকে—মানে টোর ঠাকুরডিটাকে আমার সঙ্গে ভিড়িয়ে ডে না ডিডি ?”

অন্যমনস্ক ভাবে মিনতী দেবী বল্‌লো,—“তুই নিজে গিয়ে বোল্‌লেই তো পারিস্—! ও হোল কলেজে পড়া মেয়ে! আমার কথা শুনবে কে’ন ? তোর জন্য বুঝি আমি পরের মেয়ের হাতে চড় খেয়ে মরবো ? নিজে গিয়ে একবার চড়টা খেয়ে আয় না !”

—ডুর্ টাই কি পারি ? কি রকম ডেক্‌তে হোয়েচে ডেকছিস্ না ? যেন একটা টুলোর বালিশ ! আচ্ছা ডিডি মেয়েটাকে ডামাইবাবু কোন ডোকানের টাল খাওয়ায় টুই বলটে পারিস্ ?”—

“—কেন—? তুই বুঝি সেইখান থেকে চাল কিনে খেয়ে মোটা হ’বি ভেবেছিস্ ? তা অত পয়সা পাবি কোথায় ? ওর না হয় বড়লোক দাদা আছে !—তোর কে আছে শুনি ?”

“—আমার বুঝি কেউ নেই টুই ভেবেছিস্” ? আঙ্গুলে কর গুণে ন্যাড়া তখন বোলতে লাগলো—“টুই আটিস্ বড়লোক্ ডিডি এক নম্বোর। ডাক্টার বিষ্টুডা—ডু-নম্বোর, আর টিন নম্বোর রয়েছে ডামাইবাবু—হিঃ হিঃ !”

"—তবে সেই জামাইবাবুকেই গিয়ে ধর না? আমার কাছে গজ্‌গজ্‌ করে মচ্ছিস কে'ন?"

"—আরে হাডার হোলেও টুই হট্টিস ডিডি! আচ্ছা টুই বোল্‌তে পারিস, টোর টাকুরঝিটা কোন কলেজে পড়ে?—"

"—খুব পারি! তুই বুঝি দ্বারোয়ানের লাঠি খেতে সেই জায়গায় যাবি? তাই যাস্‌—সেটা ডায়োসিশন কলেজ!"

"—কি বল্‌লি—? ডারঠঙ্কর কলেজ? বিষ্টু ডাকে বোল্‌লেই বুঝে নেবে। আচ্ছা ডারা এবার একটা এস্পার ওস্পার কোরবোই টুই ডেকে নিস্‌!—"

—"কিসের এস্পার-ওস্পার কোরবে হে? বিকেল বেলায় বাড়ী ঢুকে—পারা তো মাথায় করে নিয়েছ দেখছি?" বলতে বলতে ধীরেনবাবু হ্যাট্‌ কোট্‌ প্যাণ্ট পরিহিত অবস্থায়—অফিস ফির্‌তি বাড়ী এসে ঢুকলেন!

ধীরেন বাবুর গলার আওয়াজ পেয়েই ন্যাড়া তিন লাফে, নীচের সিড়িতে নেমে গিয়ে চেঁচিয়ে নীচ থেকে মিনতীকে ডেকে বল্‌লো—"আর এক ডিন্‌ আসবো ডিডি! বড্ড কাজ আছে রে আজ! আর একডিন আসবো!" তারপর ন্যাড়া হন্‌ হন্‌ করে পথ চলতে লাগলো।

চার

রাত্রি তখন সবে মাত্র গোটা ন'য়েক হবে ; সম্মুখে উন্মুক্ত দেশবন্ধু পার্ক ! ধীরেনবাবু তার তেতলার গাড়ীবাড়ান্দায় ইজি-চেয়ারে বসে সবে মাত্র একটা সিগারেট ধরিয়েছেন, এমনি সময়ে মিনতী দেবী এসে তার পাশে দাঁড়ালো।

স্ত্রীকে সম্মুখে দেখেই ধীরেনবাবু প্রশ্ন করলেন—"হ্যাড়া আবার আজ এসেছিল কেন ?"

নিতান্ত নিস্পৃহ ভাবে মিনতি দেবী সে কথার উত্তরে বলে, —"অমনি" !

"—অমনি তো ও বড় একটা আসে না ! কারণ নিশ্চয়ই কিছু একটা আছে !"

সে কথার উত্তর এড়িয়ে গিয়ে মিনতী বল্‌লো,—"বিলাসবাবুর যে চাকরী গেছে, সে কথা তুমি শুনেছ ?"

"—না,—শুনিনি তো— ? কেন তাই কি হয়েছে ?" বলেই ধীরেনবাবু স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।—"কিছুই যদি তাতে না হয়ে থাকে, তবে আর আমারই বা সে কথা বলে লাভ কি ?"

ধীরেনবাবু বল্‌লেন,—"হেঁয়ালী রেখে,—কি তোমার কথা—তাই বল না ?"

—"এর আবার হেঁয়ালী কি ? একটা ছা পোষা লোকের এ বাজারে চাকরী গেলে,—বাড়ীর ভাড়া সে দেবে কোথা

থেকে?" বলেই মুখখানা কালো করে স্বামীর দিকে চেয়ে রইলো।

ভাড়া সম্বন্ধে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর এই উদ্বেগটা ধীরেনবাবুর ভালই লাগলো,—তাই তিনি কথার উত্তর না দিয়ে শুধু চিন্তা করতে লাগলেন।

মিনতী দেবী বল্‌লো,—"নটিশ টটিশ নয়, তুমি কালকেই ওদের বাড়ী থেকে তুলে দিয়ে অন্য ভাড়াটে বসাও। ওরা লোকও তো তেমন সুবিধের নয়? অযথা সময় দিয়ে, খাতির দেখিয়ে—নিজেদের লোকসান কোরবে কে—এই দুর্দ্দিনে?"

এমনি সময়ে পাশের দরজা দিয়ে, মিনা এসে ধীরেনবাবুর বারান্দায় উপস্থিত হোল!

স্ত্রীকে এড়াবার জন্য ধীরেনবাবু বোনকে প্রশ্ন করে বোসলেন, —"তোমার লেডি টীচার আসেন নি?"

খিল্ খিল্ করে হেসে উঠে—মিনা বলে—"বাঃ—রে! তিনি তো আজ একমাস ধরে আসেন না,—তুমি তো তা জানোই!"

অকস্মাৎ অপ্রস্তুত হয়ে ধীরেনবাবু বল্‌লেন,—"ওঃ—হোঃ—তাইতো! তুমি তো আমায় বলেইছিলে? কিন্তু এখন পড়াগুলো কার কাছে বুঝে নিচ্ছ তাহলে। পরীক্ষা তো এসে পোড়ল বলে? আর কাউকেই বা রাখছো না কেন?—কোন লেডি প্রফেসর অথবা অন্য কাউকে?"

"—বিনে মায়নায় যেখানে মাষ্টার পেয়ে গেলুম সেখানে অযথা খরচা করে আমার লাভ?" মিনার কথায়, সহসা বাধা

দিয়ে, মিনতী দেবী বলে বস্‌লো,—"—তুমি বুঝি নীচেকার ঐ বিলাসবাবুর স্ত্রীকেই মাষ্টারনি ঠিক করেছ? তাই বুঝি অতো বারে বারে ওঁর ঘরে তোমার যাতায়াত? আমি মনে করেছিলুম বুঝি তুমি আড্ডা দিতে যাও!"

রীতিমত আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে ধীরেনবাবু মিনাকে প্রশ্ন করলেন,—"বিলাসবাবুর স্ত্রী!—তিনি কতটুকু লেখাপড়া জানেন—তোমার বি, এ-ক্লাসের পড়া তিনি পড়াতে পারেন?"—

সুচতুরা—মিনা তখন দাদার দিকে গ্রীবাভঙ্গি করে বোল্‌ল,—"কেন পারবে না দাদা? উনি নিজেই তো এম, এ-পাশ।"

—"এম, এ, পাশ! তুমি বোলছো কি—মিনা?"

ধীরেনবাবুর অবাক হবার কাণ্ড দেখে মিনা অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠলো,—"ওঁরা দুজনেই দস্তুর মতো শিক্ষিত! শুধু শিক্ষিত বল্‌লেই সবটুকু বলা হয় না দাদা—ওঁরা রীতিমত নিরহঙ্কার এবং বেশ উচু ঘরের সন্তান!"

সহসা খড়ে আগুন লেগে দপ্ করে জ্বলে ওঠার ম'ত, মুখের কথা কেড়ে নিয়ে, মিনতী দেবী মিনাকে বললো, "তুমি কিছুই জানো না ঠাকুরঝি,—তোমার ঐ মাধবী বৌদিটী হচ্ছেন এক নম্বর চালিয়াৎ! লেখাপড়া ও মোটেই জানে না, সোয়ামীর কাছে শুনে শুনে কতগুলো ওপড় চালাকী—শিখেছে শুধু। তাতেই তুমি মনে করেছ বুঝি ও এম, এ পাশ?—পাগল আর কাকে বলে!—"

কথাগুলোর ভেতরে মিনতী দেবীর যে হিংসাটা প্রচ্ছন্ন ছিল

তার সমস্তটা জ্বালা যেন অতি অকস্মাৎ মিনাকে গ্রাস করে বোস্‌লো,—মুখখানিকে রীতিমত গম্ভীর করে তখন মীনা—বোললো,—"তুমি আমার গুরুজন হতে পারো কিন্তু তাই বলে—যে একটা উচ্চ শিক্ষিতা ভদ্রমহিলাকে অমনি করে দাদার কাছে ছোট করবে?—সে আমি কিছুতেই বরদাস্ত কোরবো না। শুধু নিজের শিক্ষাদিক্ষার মাপ্‌কাঠী দিয়েই জগতটাকে বিচার করবার চেষ্টা কোরো কেন বৌদি?—আজকের যুগে কোনও উচ্চ শিক্ষিতা মহিলার নামে দাদার কাছে যা তা লাগানো—শুধু অপরাধ নয়,—দাদাকে শুদ্ধ তুমি অপমান কোরছ!" বলেই মিনা আর উত্তরের অপেক্ষা না করে, অত্যন্ত ব্যস্তভাবে নিজের কক্ষের দিকে যাত্রা কোরলো। রাগে আর অর্থহীন অপমানে মিনতী দেবীর অন্তর যেন তখন জ্বলে পুড়ে খার হয়ে যাচ্ছিল। আর ধীরেনবাবু ভাবছিলেন মিনার নতুন শিক্ষয়িত্রীর কথা।

কিছুক্ষণ বজ্রাহতের ম'ত স্তব্ধ থেকে মিনতী মুখ ভার করে ধীরেনবাবুকে বোলল—"উচ্চ শিক্ষিতা বোন যে তোমার মুখের ওপরেই আমাকে অপমান করে গে'ল,—এতে কি তোমার মান বাড়লো? না—কি দু' ভাই বোনে মিলে আমাকে তাড়াবার ফন্দি আঁট্‌ছো?

স্ত্রীর এই অসংলগ্ন প্রশ্নের জবাব দেবার—উৎসাহ ততক্ষণে ধীরেনবাবুর সমূলে বিনষ্ট হয়েছে। তবুও অন্যমনস্কের ম'ত একটা জবাব তিনি স্ত্রীকে না দিয়ে পারলেন না। বোললেন,—

"মিনা তো অপমান কিছু করে নি তোমাকে, বরং তুমিই তো তাকে আমার কাছে ছোট করলে—! ঝগড়া করবার ধৈর্য্য এবং উৎসাহ তোমার যথেষ্ট আছে জানি। অনুরোধ করলে একটা কথা শুনবে কি ?"

"—থাক আর অনুরোধে কাজ নেই! তুমি শিক্ষিত, তোমার বোন শিক্ষিত—আর আমরা হলুম সব অশিক্ষিত অপদার্থ মানুষ! আমাদের কি আর মান সম্মান আছে ?" তারপর অত্যন্ত রেগে গিয়ে মিনতী দেবী বোললো,—"বেশ বোনকে নিয়েই থেকো! যাচ্ছি আমি বাপের বাড়ীতে!"

স্ত্রীর শেষের কথায় ধীরেনবাবু অন্তরে রীতিমত বিরক্তি অনুভব করলেন—কিন্তু বাইরে তিনি সেটা যথা সম্ভব গোপন করে বললেন—"সেই ভাল, বাপের বাড়ীই তোমার উপযুক্ত স্থান! মা আজ বেঁচে থাকলে—তোমার মতন বউকে—" সহসা তাঁর গলার স্বর অস্বাভাবিক হয়ে উঠলো তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

"—আজ আমারও বাপের টাকা থাকলে, তোমাকে হাজত বাস করিয়ে, চিরজীবনের খেসারৎ—আদায় করে তবে ছাড়তুম!" বলতে বলতে মিনতী গাড়ী বারান্দা থেকে সরে পড়লো।

বোন এবং স্ত্রীর সঙ্গে এই মৌখীক বাগ্‌বিতণ্ডায় হারিয়ে যাওয়া যৌবন জীবনের একখানি বেদনা মধুর স্মৃতি ধীরেনবাবুর হৃদয়ে অকস্মাৎ উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠলো। মনে পড়লো—স্কটীস্ চার্চ কলেজের বি-এ ক্লাসের কথা। মিসেস সুপ্রিয়া দাশের সঙ্গে ধীরেনবাবুর প্রথম পরিচয় হয় সেই কলেজেই। পড়া-

শুনোর ভেতর দিয়ে তাদের জীবনে যে যোগাযোগ সংঘটীত হয়েছিল,—তাকেই বাস্তবে পরিণত করবার জন্য উভয়ের পরিশ্রমের অন্ত ছিল না! কিন্তু মিলনের পথে প্রথম বাধা দিয়ে বসলেন পিতা সৌরেন বাবু! আর তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন ছাত্র ধীরেনের স্নেহময়ী জননী—! তাঁরা ছিলেন বামুন! আর সুপ্রিয়া ছিল কায়স্থ! মাত্র এইটুকু—সামাজিক আপত্তির আছিলায় সৌরেন বাবু তার প্রিয়তম পুত্রকে রীতিমত বাধা দিলেন। ভীরু, অসহায়, অনন্যোপায় ধীরেন তখন পিতামাতার পীড়াপিড়িতে নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও মিনতীকে বিয়ে করেছিল—কিন্তু অন্তর থেকে মিনতীকে সে একটি দিনের জন্যও ভালবাসতে পারেনি!

…আর—সুপ্রিয়া? আছে আজও সে জীবিতা আছে। লেডি ডাক্তারি সে পাশ করেছিল, কিন্তু তারপর সে যে কোথায় আছে সে খবর আর তাঁর জানা নেই।

মাঝে মাঝে মনে হয় আজ যদি সুপ্রিয়াকে পাওয়া যেত? কিন্তু তারপরই তাঁর মন উদাস হয়ে ওঠে। না—না—প্রেমহীন বন্ধনে কাউকেই অন্তরে আবদ্ধ করা যায় না। একটি নিশ্বাস মোচন করলেন ধীরেন বাবু। মিনাকে তিনি ছোটবেলা থেকে মানুষ করে আসছেন তাই তাকে তিনি তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনদিনই লেখাপড়া ছাড়িয়ে, বিবাহের গণ্ডির মধ্যে এত শীগগির নিক্ষেপ করতে চান না।

মিনতীর এই নির্লজ্জ নিষ্ঠুর ভাষণে আজ অতিষ্ঠ হয়ে,

ধীরেন বাবু একবার ভাবলেন মিনার বর্ত্তমান শিক্ষয়িত্রী মাধবী দেবীর কথা !

সুপ্রিয়াকে তিনি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন। আজ শুধু এই সুশিক্ষিতা মাধবী দেবীর কথায় বহুদিন পর একবার তাঁর সুপ্রিয়ার কথা মনে পড়তেই তিনি দেখবার চেষ্টা করছিলেন, মাধবী দেবীকে সুপ্রিয়ার সঙ্গে মিলিয়ে।

অদূরের ঘড়িতে তখন ঢং ঢং করে রাত্রি দশটা বাজতে সুরু করেছিল। কাল বৈশাখীর কালো মেঘে সমস্ত আকাশ খানা তখন আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে, আর তার ফাঁকে ফাঁকে—মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকে উঠছিল। ধীরেন বাবুর ঠাকুর এসে তাঁকে রাত্রির আহারের আমন্ত্রণ জানিয়ে গেল। পাশের বাড়ীর ট্রান্সপোর্টেবল মেসিনে তখন কে যেন একখানা গান চাপিয়েছে।—

"এমন দিনে তারে বলা যায়—
এমন ঘন ঘোর বরিষায় !"......

পাঁচ

সেদিন সন্ধ্যা হবার মুখে, ক্লান্ত অবসন্ন দেহ নিয়ে বিলাস ঘরে ফিরেই প্রাণপণে গলার নেকটাইটা ধরে টানতে সুরু কোরল। যত সে তাড়াতাড়ি খুলতে চায় তত যেন নেকটাই-য়ের বাঁধন তাকে ফাঁসি দিয়ে মারতে চায়। মাধবী এ ঘরে তখন কি একটা রান্নার বাসন নিতে এসেছিল। বিলাসের অবস্থা দেখে সহসা হেসে ফেলেই হাতের বাসনটা নামিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি গিয়ে বিলাসের নেকটাই-টা খুলে দিয়েই বললো,—"তুমি মাঝে মাঝে জামা কাপড় গুলো নিয়ে অমন ধ্বস্তাধ্বস্তি করো কেন? জানো—যে পয়সা হলেও অনেক কিছুই আজকাল এ বাজারে দুস্প্রাপ্য!—তোমার এই বদ অভ্যাস কবে ঘুচবে আমায় বলতে পারো?"

ততক্ষণে প্যাণ্ট-কোট গুলো আলনায় রেখে, লুঙ্গি পরতে পরতে বিলাস বলে,—"বড়লোকের মেয়ে ছিলে মোটরেই শুধু চড়েছ, সাইকেলে তো কোনদিন চড়নি! সাইকেলে চাপলে বুঝতে, চলবার বেলায় ওতে চড়ে ভারি আরাম! কিন্তু যেই নেমেছ আর র'ক্ষে নেই, এক মুহূর্ত্তে ঘেমে একেবারে নেয়ে উঠবে! গরমের দিনে তো কথাই নেই! শীতের দিনে আরো মজা, চলবার সময় হাত পা আর কান দুটোতে, মনে হবে যেন কেউ বরফের বিছুটি মারছে। নাবলেই সর্ব্ব অঙ্গ রীতিমত সেনস্‌লেস্।"

"এই নেকটাইয়ের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করবার ব্যাপারে সাইকেলের কথা উঠছে কেন—?"

পাইচারী করতে করতে, বিলাস উত্তর দেয়,—"সাইকেলের কথা এই জন্য উঠছে যে,—আজকের দিনের কলকাতার ট্রাম, গরমের দিনের সাইকেলকেও হার মানিয়ে ছেড়েছে! উঠতে প্রাণান্তকর ধ্বস্তাধ্বস্তি, নামতে জামা ছিঁড়বে কি কাপড় ছিঁড়বে তার ঠিক নেই! আর তার ভেতরে যতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলে ভিড়ের চাপে শ্রেফ্ বাক্স বন্দী! এ হেন ট্রাম থেকে নেমে, এই বাসা পর্য্যন্ত আসতে, হাওয়া গায়ে লাগাবার জন্য যে ভাবে—ছুটতে হয়, তাতে ঘরে এসে থেমে পড়া মানেই সাইকেল থেকে নামার অবস্থা দাঁড়ালো। তখন জামা কাপড় গুলোকে মনে হয় মহাশত্রু! গা থেকে খোলার যেন আর কিছুতেই তর সয় না। তাতেই এই টান পোড়েন!"

"—উঃ—এই সামান্য একটা কথা বোলতে যদি এতো ভূমিকা দিতে হয়, তাহলে মানুষ মানুষের সঙ্গে কথা বলে কি করে? সব সময়ে তোমার কথা মানুষে বুঝতে পারে? আমার কিন্তু হাসি পায়!" তারপর সে বললো,—"রান্না ঘর থেকে ঘুরে আসছি, ততক্ষণে তুমি হাত মুখটা ধুয়ে এসো।—"

বিলাস বাথরুম থেকে ফিরে এসে মাথার চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে শুনলো—টেবিলে বসে তার ছেলে অরুণ পড়ছে,—

"বোলনা কাতর স্বরে বৃথা জন্ম এ সংসারে,—
এ-জীবন নিশার স্বপন;"

ঐ পর্য্যন্ত শুনেই বিলাস মাথার চিরুনি হাতে নিয়ে ছেলেকে বললো—"দাঁড়াও বাবা ওটা কিন্তু আজকের দিনের কবিতা নয়—এখন পড়তে হবে—"

বলিও কাতর স্বরে মিথ্যা জন্ম এ সংসারে,—
এ-জীবন বিভ্রান্ত স্বপন ;—

বিলাসের কাণ্ড দেখে এ ঘরে ঢুকেই মাধবী বলে উঠলো, "তুমি আরম্ভ করলে কি ? ছেলেটাকে পড়তেও দেবেনা দেখছি !"

"পড়তে দেব'না মানে ?—ছেলে-কি আমার সেকেলে নাকি ? ছুদিন পরে বড় হলেই তো ও বুঝবে, এ সংসারে জন্মানটাই ওর বৃথা হয়েছে। দেখতে পাচ্ছনা কত টাকা মনের চাল ! কো'ন ভদ্র সহরে বাস করবার জন্য বাড়ী মেলেনা,—এককাঁড়ি পয়সা দিয়েও সময় মত খাদ্য সামগ্রী পাওয়া যায় না ! এই যুগে বসে, 'বোলনা কাতর স্বরে'—ছেলেকে শেখালে, একদিন ও পরিস্কার বুঝবে, বাপ্‌ মা ওকে ভুল শিক্ষা দিয়েছে।"

"—তা হাজার হলেও ওগুলো হিতোপদেশের মত কথা তো ?—ছেলেকে কে আর অত বুঝিয়ে পড়াতে যায় ? যত সব তোমার পাগলামী !" বলেই মাধবী হাসতে হাসতে সুরু করে —"বেশ, তা হলে বলে দাও কি পড়বে তোমার ছেলে ?" তারপর হেঁসেলের দিকে যেই পা বাড়াতে যায় মাধবী, অমনি তার বাঁ হাতটা চেপে ধরে বিলাস বলে,—"দাঁড়াও !" আর ছেলেকে হুকুম করে, "কাজী নজরুল ইসলামের অগ্নিবীণাটা নিয়ে এসো তো বাবা ! তারপর পাঁচের পাতাটা খুলে সেই 'বিদ্রোহী' কবিতাটা পড়'তো !"

পিতৃ আজ্ঞায় অরুণ তাড়াতাড়ি বই-এর সেলপ্ থেকে বইখানা নিয়ে এসেই পড়তে স্বরু কোরল—

"—বল বীর—
বল উন্নত মম 'শির
শির নেহারি আমারি, নত শির ওই শিখর হিমাদ্রির !
বল বীর—
বল—মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি'
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহতারা ছাড়ি'
ভূলোক দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া,
খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া,
উঠিয়াছি চির বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাত্রীর !
মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে—রাজ—রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর—!
বল বীর—
আমি চির উন্নত শির !"

প্রশংস দৃষ্টিতে ছেলের দিকে চেয়ে বিলাস বললো—"চমৎকার ! তুমি পড়ে যাও—আমরা গাড়ী বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছি।" বলেই—মাধবীকে নিয়ে পাশের দরজা দিয়ে বিলাস দোতলার গাড়ী বারান্দায় গিয়ে উপস্থিত হ'ল। বাইরে থেকে অস্পষ্টভাবে তখনো শোনা যাচ্ছিল,—অরুণ পড়ে চলেছে :—

"আমি চির দুর্দ্দম দুর্বিনীত, নৃশংস,
মহা-প্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস,
আমি মহা-ভয়, আমি অভিশাপ পৃথ্বির !"......

বারান্দায় দাঁড়িয়ে মাধবী হাসে আর বলে,—"এ সব তোমার পাগলামো নয় ? কি বুঝবে ঐ টুকু ছেলে ঐ কবিতার।

মুখস্ত করিয়েছ তাই—ও তো নেশার ঝোঁকেই পড়ে চলেছে। ওর একটা লাইনেরো অর্থ বুঝবে না—ও। মাঝখান থেকে ছেলেটা বয়ে যাবে!"

মাথা চুল্‌কে বিলাস উত্তর দেয়, "বয়ে গেলেই হোল? কিন্তু—শীর্ণ, শান্ত, সাধু ছেলেকে দিয়েও এ যুগে কাজ চলবে না! তাই বলে তোমার ঐ হিতোপদেশ আমি ছেলেকে কিছুতেই শেখাতে রাজী নই! সেকালে তিন টাকা মনের চাল ছিল। মাছ, কাপড়, তরি তরকারীর তো কথাই ছিল না;—মৌজ করে দিব্যি পেট ভরে চব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য পেয় খেয়ে কবি লিখলেন,—'বোলো না কাতর স্বরে বৃথা জন্ম এ সংসারে',—সেই কথা আজকের যুগের ছেলেকে পড়িয়ে আমি ছেলেটার পরকাল ঝরঝরে করে দোবো তুমি বলতে চাও?"

মাধবী মনে মনে বুঝলো, এটা বিলাসের মস্তিষ্ক বিকৃতির পূর্ব্ব লক্ষণ। তাই ছেলের লেখাপড়া সম্বন্ধে স্বামীর সঙ্গে আলোচনা নিরর্থক মনে করে সে অন্য কথা সুরু কোরলো!

—"আমি বলছিলুম—এই চাকরীর জন্য অযথা ছুটোছুটি না করে একটা কিছু ছোট খাটো ব্যবসায় লেগে গেলে হোত না?"

"—হোত বই কি! মূলধন দেবে কে?"

"—কি ব্যবসা করবে আগে শুনি?"

"—ব্যবসা ধর না কে'ন—এই চাল ডালের কারবার! জমি বেচা কেনা, ষ্টেশনারী দোকান—ডাইং ক্লিনিং—রেষ্টুরেন্ট, আর কতো বোলবো?"

"—গোড়ার গুলো যা বললে সে তো অনেক টাকার ব্যাপার! কিন্তু শেষের ওগুলোতে কি রকম মূলধন লাগবে শুনি? আর—মাস গেলে লাভই বা থাকবে কতো?"

"—ব্যবসাটা একবার ফেঁদে না বসতে পারলে লাভের কথা তোমায় আজকেই কি ক'রে বোলবো? তবে ব্যবসা মানেই এযুগে টাকা ইন্‌ভেষ্ট্‌মেণ্টের ব্যাপার। সে তুমি আর হাজার দেড় হাজারের কমে কি আসা করতে পারো?"

"—আমার এই সব গয়না বেচলে এখন কত টাকা হতে পারে—? প্রায় বিশ ভরি সোণা তো রয়েইচে!"

ছুই চক্ষু বিস্ফারিত করে, বিলাস বলে, "—ঘরের গয়না বেচে ব্যবসা! র'ক্ষে করো ওতে আমার কাজ নেই! শেষ-কালে যদি ব্যবসায় ফেল মেরে দি—তখন?—অমন ব্যবসায় কাজ নেই। তার চাইতে বরং দালালি কোরবো!"

চিন্তান্বিত ভাবে মাধবী তখন জিজ্ঞাসা কোরলো—"আজ কোথায় কোথায় ঘুরলে?"

"—ঘুরলুম মানে?—দস্তুর মত চাকরীর উমেদারী করে এলুম! শালকে তেল কল থেকে সুরু করে গিলেণ্ডারের জুট মিল—কোথাও বাদ নেই!"

"—তাতে হবার আশা হোল কিছু?"

"—আশা?—নিশ্চয়!—আশা আছে বই কি! ছার্টিফিকেটে একটা এম, এ ডিগ্রী রয়েছে। মুখের ওপরে আর কি করে বলে, যে—আসবেন না মশাই! তাতেই সহানুভূতি

দেখিয়ে বেশীরভাগ কোম্পানীর কর্ম্মকর্ত্তারাই বোললেন, 'আসবেন মাঝে মাঝে দেখবো!' অতএব আমিও মাঝে মাঝে নিত্য নূতন জায়গায় গিয়ে, একদিন ঘরে ফিরে নেকটাই ছিঁড়বো—আর একদিন ছিঁড়বো প্যান্টলুন!" একটু থেমে শেষে বলে, "এই ম্লেচ্ছ পোষাকটা আমি আর কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারি না! লজ্জাও করে, গরমেও মরি! তুমি বরং কাল থেকে আমার ধুতিপাঞ্জাবীর ব্যবস্থা দেখ।"

ইতিপূর্ব্বে মাধবী অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, বিলাসের কথা তার কানে ঢোকেনি। তাই সহসা সে চম্‌কে বলে উঠলো,—"ঐ-যাঃ—কখন সেই কেটলিতে জল চাঁপিয়ে এসেছি,—তোমারও চা খাবার তাড়া নেই, আমারও মনে নেই! দাঁড়াও চা টা আগে নিয়ে আসি!"

মাধবী চলে গেলে,—বিলাস অনেকক্ষণ পার্কের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবতে লাগলো—তার বর্ত্তমান জীবন, আর ফেলে আসা দিনগুলির কথা! কতই না মধুময়ী—জীবনের সূত্রপাত করেছিল তারা! মাধবী তখন তার সহপাঠী! দুজনেই এম-এ ক্লাসে পড়ে! বিলাসের কাছে, যে মাধবী ছিল একদিন আকাশ কুসুম কল্পনার বস্তু—সেই মাধবী তাকে বিয়ে করবার প্রতিশ্রুতি দিলো! মাধবীর ব্যারিষ্টার পিতা—সে জন্য তাকে কত শাসালেন—কত গাল মন্দ করলেন,—একমাত্র কন্যা হলেও তিনি তাকে বিপদে সাহায্য করবেন না বলে ভয় পর্যন্ত দেখালেন। মাধবী কিছুই গ্রাহ্য করে নি। তারপর সত্যিই যেদিন মাধবী

তার স্যুটকেশটা নিয়ে এসে বিলাসের বোর্ডিং-এ উঠলো,— সেদিনের কথা বিলাস জীবনেও ভুলতে পারবে না। তারপর মনে পড়ে মাধবীকে নিয়ে সংসার পাতানোর কথা। ঘর আলো করে প্রথম সন্তান যেদিন তাদের কোলে এলো একটী ফুটফুটে মেয়ে, সে যে কি একটা দিন গেছে তার কল্পনায়ও সুখ ছিল। ভগবান তাদের সে আনন্দে এনে দিলেন আপশোষ—সেই শিশু কন্যাটীকে অকালে হরণ করে। তারপর এসেছে এই অরুণ! বেকার সমস্যা দেশে যখন প্রবল হয়ে উঠলো তখনই বিলাসের চাকরীটাও গেল চলে! এই দুর্মূল্যের বাজারে এখন সে সংসার চালাবে কি করে? এ বাজারে চাকরী একটা দুঃস্বপ্ন! দিনের পর দিন কাজ কারবার সব গোল্লায় যাচ্ছে; একটার পর একটা কোম্পানী রোজ ফেল মারছে! ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলোর অবস্থা চরমে উঠেছে! চতুর্দ্দিকে শুধু ঘনায়মান দুর্য্যোগ আর দুর্দ্দশার প্রতিচ্ছবি, বিলাস আর ভাবতে পারে না! অনন্ত অকূল এই দুর্ব্বিপাক সমুদ্র-তরঙ্গে পড়ে কেবলি সে যেন কোথায় তলিয়ে যেতে লাগলো।

এমনি সময়ে চা আর কিছু জল খাবার নিয়ে মাধবী গাড়ীবারান্দায় এসে হাজির হোল! চায়ের কাপটা হাতে তুলে দিয়ে বিলাসের চিন্তান্বিত মুখের দৃশ্য দেখে মনে মনে রীতিমত চমকে উঠলো মাধবী!

মাধবীর চোখে চোখ পড়তেই বিলাস কৃত্রিম উল্লাসে

নিজেকে উল্লসিত করে বলে উঠলো,—রবীন্দ্রনাথ কি আর সাধে লিখেছিলেন—

"সমাজ সংসার মিছে সব
মিছে এ জীবনের কলরব,
কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা দিয়ে—
হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব,—"

নিজের চায়ের কাপটায় চুমুক দিতে দিতে, মাধবী বলে—"চোর যে—সে অমনিতেই ধরা পড়ে ; টাকার চিন্তায় এতক্ষণ যে দুর্ভাবনাটা মাথায় গজিয়েছিল, সেইটেকে চাপা দেবার জন্যই তো হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভবের কথাটা, মুখে ফুঠলো ? কিন্তু ঐ-'সমাজ সংসার মিছে সব', কথাটা না যোগ করলেই পারতে ?"

কৃত্রিম ভর্ৎসনার সুরে সে কথার উত্তরে বিলাস বলে,—"তোমার চাইতে মারাত্মক দুষ্টু মেয়ে—এ-সংসারে আর একটীও জন্মায় নি!"

—তা হলে আর কাল্পনিক দুর্দ্দশার ভাবনাগুলো ভেবে লাভ কি! অতুলপ্রসাদ সেন লিখেছিলেন জানো তো?—"

—"মিছে তুই ভাবিস মন,
গান গেয়ে যা গান গেয়ে যা
আজীবন।
পাখীরা সব বনে বনে
গাহে গান আপন মনে,
নাই বা যদি কেহ শোনে
গেয়ে যা তুই অকারণ।"

নাও এবার এস দেখি অরুণের পড়া নিয়ে, ওকে শুতে দিয়ে—খেতে বসবে চ'ল !

—"তবে তাই চলো— ।" বলতে বলতেই বিলাস গানের সুরের ভঙ্গিতে আরম্ভ কোরলো :—

"তোমারেই করিয়াছি জীবনেরি ধ্রুবতারা,
এ সমুদ্রে আর কভু হব নাকো পথ হারা !"

গানের পদ শুনে পেছন ফিরে বিলাসের মুখের দিকে একবার হাস্য-বিনিন্দিত চোখে চেয়েই মাধবী গাড়ীবারান্দা থেকে কক্ষের ভেতরে ঢুকে পড়লো।

ছয়

দুপুরের খাওয়া-দাওয়া শেষ করে বিলাস কোথায় যেন বেড়িয়েছে। মাধবী দেবী এই মাত্র মধ্যাহ্ন ভোজনের পালা শেষ করে, আরাম কেদারায় বসে গা এলিয়ে পান চিবুচ্ছিল! এমনি সময় তেতলা থেকে মিনাকে হাত ধরে টান্‌তে টান্‌তে, অরুণ এসে মায়ের কাছে উপস্থিত হোল। মিনার মুখের দিকে চেয়ে মাধবী বললো,—"ব্যাপার কি?"

মিনা মুচকি হেসে উত্তর দেয়,—"আপনার ছেলেকে জিজ্ঞেস করুন।"

মাধবী দেবী কিছুই না বুঝতে পেরে দু'জনের মুখের দিকেই অবাক্ হয়ে চেয়ে রইল।

অরুণ বলে,—"মিনাদি তোমার ওপর রাগ করে কি বলেছে জানো—মা?—বলেছে তোমাদের ঘরে আর কক্ষনো আমি ঢুকবো না! তুমি মিনাদিকে গাল মন্দ করেছ হ্যাঁ—মা?"

এতক্ষণে ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করে মাধবী দেবী সহজ স্বরে ছেলেকে বলে উঠলো,—"তোমার দিদি আমার কথা শোনে না কেন?—তাই গাল মন্দ করেছি! তা তুমি তোমার দিদিকে নিয়ে এত শীগগির এলে কেন—বাবা?"

অরুণ তখন হাত পা নাচিয়ে বললো,—"বা-রে! আমায় যে মিনাদি চকোলেট দেবে! তুমি একটা গল্প শুনিয়ে দাও না মা মিনাদিকে!"

—"কিন্তু আমি যদি গল্প না বলি, তবে তো আর চকোলেট দেবে না তোমাকে মিনাদি ?"

আশাহত বালক অরুণ তখন কাতর দুটী চক্ষু মেলে মিনার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। তাই দেখে মিনা অরুণকে কোলে তুলে, গালে চুমো খেতে খেতে বোললো—"তুমি কিচ্ছু ভেব না ! এই দেখ না— ? তুমি আগে একটু ঘুমিয়ে নাও—তারপর উঠেই দেখবে ঠিক তোমার মাথার কাছে বিস্কুটের টিন আর চকোলেট কেমন প্যাট্ প্যাট্ করে চেয়ে রয়েছে ! তুমি ঘুমোও। আমি এক্ষুণি নন্দকে দোকানে পাঠিয়ে তোমার বিস্কুট চকোলেট সব আনিয়ে রাখবো !—তুমি শোও আগে ! শুয়ে এক্ষুণি আগে ঘুমিয়ে পড়ো—তবে তো ?"

এদের কথাবার্ত্তার মাঝখানে মাধবী দেবী বইয়ের সেলপ্ থেকে জন্ রাস্কিনের একখানি জীবনী গ্রন্থ নিয়ে তারই পাতা ওল্টাচ্ছিল। মিনা অরুণকে বিছানায় ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে, মাধবীর কাছাকাছি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বোললো—"ওটা কার বই বউদি ?"

"জন্ রাস্কিনের জীবনী ! পড়েছ তুমি তার কোন বই ?"

মিনা প্রথমতঃ একটু ভাবলো। তারপর বোললো,—"জন্ রাস্কিন্ ? সেই মহা বিদ্বান—দানবীর রাস্কিন্ ? যিনি তার শেষ জীবনের সমস্ত সঞ্চয় শুধু লাইব্রেরী আর পাঠাগার স্থাপনের কাজে দান করে গেছেন ?"

"—হ্যাঁ গো হ্যাঁ,—সেই নয় তো আর কে? পড়েছ তুমি তার 'ষ্টোন্ অফ ভেনিস্' বইটা?" বলেই সে মিনার মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

উৎফুল্ল মিনা উত্তর দেয়,—"না তো? আমি তাঁর 'মডার্ণ পেইণ্টার্স্' বইটা পড়েছি। আছে আপনার?" এইটেই বুঝি ষ্টোন অফ্ ভেনিস?"

না—এটা তাঁরই অন্য একটা বই? তুমি লাইব্রেরী থেকে আনিয়ে পড়ে ফেলো।"

"—বইটা বুঝি খুব ভালো? কি আছে বইটাতে বউদি?"

"—আগেই যদি বলে দি তবে কি আর পড়তে আনন্দ পাবে? বইটা এনে আগে পড়ে ফে'ল—তারপর একদিন তাই নিয়ে আলোচনা করা যাবে।" বলেই অন্যমনস্কের মত কাতর দৃষ্টিতে দূরের দিকে চেয়ে মাধবী দেবী কি যেন ভাবতে থাকে।

মিনা বার কয়েক ঘরের ভেতর পাইচারী কোরলো। একবার জানালার পথে বাইরের দিকে চেয়ে দেখলো। তারপর আবার এসে সে মাধবীর কাছে চেয়ারে উপবেশন কোরলো।

মাধবী বললো—"আজকের এমন একটা মেঘাচ্ছন্ন রবিবারে তুমি তো কৈ ঘুমোলে না মিনা? কারো প্রেমে-টেমে পড়লে নাকি? কেবলি ঘুরে বেড়াচ্ছ। নানা রকম কথা বোলছ, অথচ কাজের কথাটি তো বোলছ না? হোল কি তোমার শুনি, দাদা বাড়ী নেই বুঝি?"

খিল খিল করে হেসে উঠে মিনা উত্তর দেয়,—"দাদা বাড়ী না থাকলেই বুঝি ঘুমুতে নেই? আপনার এক একটা কথা শুনলে এমন হাসি পায়! আচ্ছা বৌদি আপনার ধারণা অনুসারে, আমার ম'ত মেয়েরা—অর্থাৎ অনূঢ়া আর কুমারী মেয়েরা তো এই বয়সে শুধু প্রেমেই পড়ে! কিন্তু—আপনার মতো বিবাহিতা বৌদিরা কিসের চিন্তা করে বলতে পারেন?"

চাকরীর উমেদারী করতে ভাত কটি মুখে গুজেই রবিবারের ছুপুর বেলায় বিলাস যে কোথায় বেরিয়ে গেছে, সেই চিন্তাই মাধবীকে এতক্ষণ আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। মিনার প্রশ্নে সহসা তার চমক ভাঙ্গলো। বললো—"বউদিরা ভাবেন তাদের ফেলে আসা জীবনের পতি নির্ব্বাচনটা সুখের হয়েছে কি দুঃখের হয়েছে সেই কথা!" বলেই সে একটু হাসলো।

গম্ভীর ভাবে মাথা ছুলিয়ে মিনা বলে,—"উহুঁ! কথাটা কিন্তু ধোঁকা দেবার ম'ত শোনাচ্ছে বৌদি! বাদশাহী আমলের আগে; জয়চাঁদ, পৃথ্বীরাজ, কৃষ্ণা, পদ্মিনী. সীতা, অরুন্ধতী, প্রভৃতির মধ্যে এ রকম একটা প্রথা প্রচলিত ছিল বলে ইতিহাসে পাচ্ছি; কিন্তু এ যুগের বাঙ্গালী সমাজে এই পতি নির্ব্বাচনের কথাটা কি আর সত্যি বউদি?"

মুচ্‌কি হেসে, কথাটায় একটু জোর দিয়ে, মাধবী উত্তর দেয়,—"সত্যি নয়তো কি? শুনছো না আজকাল কেবলি শোনা যাচ্ছে—মেয়েরা ভয়ানক সেচ্ছাধীন! গুরুজন-টন্ তারা ছু' চক্ষে দেখতে পারে না! ট্রামে উঠে বেড়ায়, বেটাছেলের

পাশে বসে চাকরী করে, মিটিংএ বক্তৃতা দেয়, বিবাহ বিচ্ছেদের আইন পাশ করিয়ে নেয়; যার তার সঙ্গে বিয়ে বসে;—এ সব বুঝি মিথ্যে?"

কক্ষের ভেতরে বার কয়েক অকারণেই পায়চারি করে নিয়ে, মিনা কি যেন ভেবে নেয় কিছুক্ষণ। পরে হঠাৎ হেসে বলে ওঠে,—"কেবলি আমাকে রাগাবার চেষ্টা হচ্ছে তো? কিন্তু আমি আপনাকে সহজে ছাড়ছিনে বউদি! জন কয়েক মুষ্টিমেয় মেয়ে—পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহে পড়েই হোক, আর পারিপার্শিক সংসর্গ, আবহাওয়া, অথবা গুরুজনের অতিরিক্ত অস্কারার ফলেই হোক, এ কথাগুলো এ দেশে আজকাল অনেকেই রটাচ্ছেন তাদের নামে। তাই বলে এইটেই যে অবধারিত সত্য এবং প্রত্যেক মেয়ের প্রতিই এটা যে প্রযোজ্য, সে কথা আপনি কি করে বলবেন?"

ছেলে অরুণের একটা জামা সংস্কারে হাত দিয়েছিলো মাধবী দেবী। দাঁত দিয়ে সেলাইয়ের সুতোটা কেটে নিয়ে সে বললো,—"তা হলে দেখা যাচ্ছে, পতি নির্ব্বাচনের ব্যাপারে তোমার তেমন স্পৃহা নেই! আমরা তা হলে বিয়েই দোবো তোমাকে—কি ব'ল?"

ঠাট্টার ভঙ্গিতে উচ্চহাস্য করে মিনা বলে,—"পরের মেয়ের বিয়ের জন্য আপনার অতো মাথাব্যথা কেন বউদি, নিজের একটা উপযুক্ত মেয়ে নেই বলে বুঝি?"

"—থাকলেই কি আর আমার মেয়েকে আমি বিয়ে দিতুম

চট্ করে? লেখাপড়া শিখে ছেলেদের মত উপযুক্ত হয়ে নিয়েই তো মেয়েদের বিয়ে বসা উচিৎ! নইলে এ যুগে চলবে কি করে?"

—"এই দেখুন বউদি? ধরা দিচ্ছেন কিন্তু নিজেই। আপনি বলছেন বিয়ে বসা উচিৎ! তা হলেই সোজা কথায় বলছেন বিয়ে করা উচিৎ নয়! অগত্যা প্রেম কর্ত্তেই তো বলছেন? তবে আর এ যুগের মেয়েদের দোষ কোথায় শুনি?"

কৃত্রিম অপ্রস্তুতির ভঙ্গিতে মুখ খানি কাঁচুমাচু করে মাধবী উত্তর দেয়,—"আমি কি দোষের কথা বললুম ছাই? বললুম আগে মানুষ তো হ'তে হবে? শিক্ষাটাই হচ্ছে আসল কথা। তাই বলে আমি এ কথাও বলছিনে—যে এম-এ-বি-এ, পাশ করলেই মেয়েরা শিক্ষিতা হবে! সংস্কার মুক্ত হওয়াটাই হচ্ছে মেয়েদের প্রথম এবং প্রধান কাজ! পরিচ্ছন্নতার মানে যেমন ছুঁচি বাই গ্রস্থ হওয়া নয়, তেমনি সংস্কার মুক্ত হওয়ার মানেও, পাঁচজনের সঙ্গে এক টেবিলে বসে, যা-তা খেয়ে সেচ্ছাচারীতা অনুসরণের নামে পাশ্চাত্য সভ্যতা শিক্ষা করা নয়।"

"এ আবার একটা মজার নতুন কথা শোনালেন বউদি? এটা সমর্থন করতে রাজি আছি। কিন্তু এতে তো প্রেমে পড়ার মিমাংসা হোলো না বউদি?"—মিনা উত্তর দেয়।

"আর মিমাংসায় কাজ নেই। এবার তুমি পালাও দেখি আমি ঘরের কাজ সারবো!"

"—তাড়ালেই কি আর আজ আমি সহজে বিদেয় হচ্ছি?

এই দেখুন না আপনার কাজ করে দিচ্ছি"—বলেই সে আলনা গোছাতে সুরু ক'রে, ক্রমাগতই সেটাকে এলোমেলো করে তুলতে লাগলো।

মাধবী তাড়াতাড়ি মিনার হাত থেকে কাপড় টেনে নিয়ে হাসতে হাসতে বললো—"খুব হয়েছে থাক! যে পাকা হাত আমার গোছানো আলনাটা দেখছি কেবলি অগোছাল হয়ে উঠছে?"

ঘরের মেঝের দিকে চেয়ে তখন মিনা বলে—"ওঃ—মেঝেটাই তো দেখছি অপরিস্কার হয়ে রয়েছে, আচ্ছা আনুন ঝাঁটা এইটেই তা হলে আগে পরিষ্কার করে ফেলি?"

মিনাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে হাসতে হাসতে মাধবী বললো,—"করিতকর্ম্মা মেয়ে যা হোক বাবা! তুমি দেবে ঘর ঝাঁট আর ঝাঁটার জোগান দিতে হবে বুঝি আমাকে?"

তারপর—আদর করে মিনাকে কোলে টেনে নিয়ে চেয়ারে বসিয়ে মাধবী প্রশ্ন করে,—"আচ্ছা মিনা তুমি আমাকে এত ভালোবাস কে'ন—ব'লতো? এত যে দূর-ছাই করি দিন রাত,—তাও কি তোমার রাগ হয়না একদিনও আমার ওপরে?"

বুকের ওপর থেকে মাধবী দেবীর জড়ানো হাত দুখানি আস্তে ছাড়িয়ে, পাশের একটা চেয়ারে উঠে গিয়ে বসতে বসতে মিনা বলে,—"রাগ হয় না আবার? এই দেখুন না আপনার ছেলে ওপরে গিয়ে বিরক্ত করছিল বলে রেগে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিলুম। আপনার সঙ্গে শুধু শুধু ঝগড়া করবো—তাই

দাদাকে বলে লেডি টিচার উঠিয়ে দিয়ে সকালে বিকেলে আপনার ঘরে আড্ডা গেড়েছি। আমার বউদি আপনাকে অপমান সূচক কথা বলেছিল বলে, দিলুম তাঁকে এমনি চটিয়ে যে—রেগেমেগে সে বেচারী দাদার সঙ্গে ঝগড়া করেই চলে গেল বাপের বাড়ীতে! এত রাগ আমার তবুও বলবেন—আপনাকে আমি ভালোবাসি?”

সহসা দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে মাধবী বলে,—“ওমা সে কি! তাই বুঝি তোমার বউদি এখানে নেই। ছিঃ ছিঃ এ সব তো সত্যিই ভালো কাজ করোনি! তাই বুঝি তোমার দাদা, গিন্নীর শোকে বিবাগী হয়ে কেবলি বাড়ী ছেড়ে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন? এ রকম করলে তো সত্যিই দেখছি দুচার দিনের মধ্যেই আমাদেরো এ বাড়ী ছেড়ে পালাতে হবে! আমাকে তোমার বৌদি যাই বলুন না। সেজন্য তুমি তাঁকে চটাতে গেলে কে'ন বল দিকি?”

বিশুষ্ক মুখে বিরক্তির ভঙ্গিতে মিনা ব'লে উঠলো—“ও—যা বউদি ওকে আবার চটাতে হয় নাকি? ও তো চটেই থাকে। ওর মাথায় রয়েছে মান্ধাতার আমলের গোবর পোরা! মানুষের শিক্ষা দিক্ষা ও দু'চক্ষে দেখতে পারে না। তা ছাড়া সংসারের অন্য কোন মানুষ সুখে থাকে, তা ওর অসহ্য! দাদা কখন অফিস ফির্‌তি নিরিবিলি বসে দুটো কাজের কথা চিন্তা করছে—না সেখানেও ওর সন্দেহ…”

খিল খিল করে হেসে উঠে—মিনার মুখের কথা কেড়ে

নিয়ে মাধবী বলে—"তোমার দাদার কাজ কর্ম্মের চিন্তায় তাঁর কিসের সন্দেহ ?"

"—ও মা! তা জানেন না আপনি? প্রেম—! বউদি পরকীয়া প্রেম। মানে বউদি ছাড়া আর কারো কথাও তো দাদা ভাবতে পারে? তা হলেই তো সম্পত্তি বেহাত! এর পরও আপনি বউদিকে সন্দেহ করতে নিষেধ করছেন ?"

উচ্চহাস্য করে মাধবী বলে ওঠে,—"জানিনে বাপু তোমার দাদা বউদির কাণ্ড! তারপর ?"

—"তারপর আপনি ঝাঁটাটা বের করুন, আমি ওপর থেকে একবার ঘুরে আসছি।" বলেই মিনা ছুটে ওপরে চলে গেল।

মিনার কথাবার্ত্তার ভেতর থেকে একটা অহেতুক কৌতূহলের সূত্র অবলম্বন করে, উৎফুল্ল মনে, গানের একটি কলি গুণগুনিয়ে মাধবী দেবী তড়িৎ হস্তে সাংসারীক কাজ সারতে সুরু করলো!

কিছুক্ষণ পরে বোগলে একটা বিস্কুটের বাক্স আর ডানহাতে চকোলেটের প্যাকেট নিয়ে, ঘরের বাইরে থেকে বার কয়েক উঁকী ঝুঁকি মেরে, মাধবীকে দেখতে না পেয়ে, মিনা বরাবর অরুণের বিছানার পাশে এসে তার মাথার বালিশের কাছে, বিস্কুটের বাক্স আর চকোলেটের প্যাকেটটী নামিয়ে রাখলো। মাধবী তখনো হেঁসেলের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। ততক্ষণে মিনা অরুণের পায়ের তলায় সুড়সুড়ি দিয়ে তার ঘুম ভাঙ্গালো!

উঠে বসেই, চক্ষু রগড়াতে রগড়াতে—অরুণ ঘুম জড়ানো

চোখেই বলে বসলো,—"আমার চকোলেট ?" মিনা বললো,—"হাতটা পাতবে তো ? এই নাও। শীগগির ধরো আমি পালাই ! চেপে ধরো না আগে এই বিস্কুটের বাক্সটা ? মা এসে পড়লেই তুলে রাখবে সব ! শীগগির ধরো আমি পালাই !"

মায়ের নামে ভয় দেখাতেই অরুণের চোখের ঘুম গেল পালিয়ে। বড় বড় করে চোখ মেলে, মিনার হাত থেকে বিস্কুটের টিনটা আগে টেনে নিয়ে সেটাকে সে বোগলে শক্ত করে এঁটে ধরলো। তারপর ডান হাত খানা বাড়িয়ে চকোলেট চাইতেই, মিনা বড় একখানা চকোলেট অরুণের মুখের ভেতরে ভ'রে দিয়েই বলে,—"চট পট খেয়ে ফেলো।" কিন্তু বালক অরুণ সেটা মুখের মধ্যে নিয়ে, না পারলো ফেলতে, না পারলো ওগরাতে। ঠিক এমনি সময়ে মাধবী দেবী দরজার চৌকাঠ আগলে—মিনা আর তার ছেলের কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

হঠাৎ সামনা সামনি মায়ের ঐ মূর্তি দেখে অরুণ তো বিস্ময়ে আর ভয়ে হতভম্ব ! ব্যাপার দেখে মিনা, পেছন ফিরে চেয়েই মাধবীকে বলে উঠলো,—"এরই মধ্যে বুঝি আপনার কাজ হয়ে গেল ! আমরা ভাই বোনে মিলে চকোলেট আর বিস্কুট খাচ্ছি বলে অমন করে চোখ দিচ্ছেন কেন ! হিংসে হচ্ছে বুঝি ?"

মিনার সে কথার উত্তর না দিয়ে, ঘরের ভেতরে ঢুকতে

ঢুকতে মাধবী বললো—"সত্যিই মিনা তুমি এ সব কোচ্ছো কি ব'লতো? পয়সা নষ্ট করে তোমাকে অতগুলো চকোলেট বিস্কুট কে আনতে বলেছিল এক্ষুনি?" তারপর অরুণের দিকে চেয়ে কৃত্রিম রাগত স্বরে সে বললো,—"রাক্ষুসে ছেলের কাণ্ড দেখে আর বাঁচিনে! অতবড় চকোলেট-টা মুখের মধ্যে পুরে অমন হা করে চেয়ে রয়েছ কেন! টুকরো করে ভেঙ্গে ভেঙ্গে খাওয়া যায়না বুঝি? গাধা কোথাকার!"

মায়ের কথায় অরুণের চোখে তখন জল ভরে উঠেছে। সেই অবস্থা দেখে মিনা তাকে তক্ষুনি কোলে তুলে নিয়ে বাইরে চলে গেল।

একটুক্ষণ পরে মিনার নাম ধরে ডাকৃতে ডাকৃতে ধীরেন বাবু উপরে উঠে চলে গেলেন।

সন্ধ্যা হতে তখনো অনেক দেরি। মাধবী দেবী একবার ভাবলো, মিনাকে ডাকবার কথা। কিন্তু পরক্ষণেই তার দাদার আগমনের সাড়া পেয়ে সে ব্যাপারে ক্ষান্ত হলো। অসংলগ্ন চিন্তার সূত্র ধরে ভাবতে ভাবতে সহসা বিলাসের কথা মাধবীর হৃদয় পটে উদয় হলো। লোকটা সেই যে কখন বেরিয়েছে, এখনো ফিরছে না কে'ন? রাস্তার পাশের গাড়ীবারান্দার দিকে ঝুঁকে পড়ে মাধবী তখন রাস্তার দিকে চেয়ে তন্ন তন্ন করে বিলাসকে খুঁজতে লাগলো।

সাত

বেলা দশটা থেকে পাঁচটা পর্য্যন্ত বড় বড় সব অফিসার আর দেশ নেতাদের বাড়ী বাড়ী চাকরীর উমেদারী করে, বিলাস যখন বউবাজার আর সেণ্ট্রাল এভিনিউর মোড়ে এসে পৌঁছেচে, বেলা তখন সাড়ে পাঁচটা। ছুটির দিন। ট্রাম বাসে তেমন ভিড় ছিল না, কিন্তু ফুটপাতে আর লোক চলাচলের বিরাম নেই। খানিকক্ষণ তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিলাস দেখলো! কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই সাংসারিক দুশ্চিন্তায় তার মনটা আবার চিন্তিত হয়ে উঠলো। সবে মাত্র বৈশাখী উত্তাপের প্রচণ্ডতা হ্রাস হয়ে আসছিল, উত্তর দক্ষিণ খোলা এই বড় রাস্তাটায় বাতাস ছিল প্রচুর, কিন্তু সে বাতাসে না ছিল শীতলতা না ছিল আরাম। তার ওপরে, মোটরের পর মোটর আর অসংখ্য পথচারীর ভিড়ে বিলাসের বুকের ভেতরটায় যেন হাঁপ্ ধরে উঠ্ছিল। বেশীদূর তাকে যেতে হয় নি; রাস্তার মাঝামাঝি পথে উপনীত হবার পূর্ব্বেই পায়ের জুতোর তলায় এক খণ্ড সদ্য খেয়ে ফেলা আমের ছিবড়েয় পা পিছলে সে—সেই পিচের রাস্তার ওপরেই ভয়ানক রকম একটা আছাড় খেয়ে পড়লো। ঠিক সেই সময়েই একখানা প্রাইভেট মোঠর গাড়ী বউবাজারের মোড়ে সেণ্ট্রাল এভিনিউতে টার্ণ নেবার মুখে, হটাৎ ব্রেক কসে সহসা থেমে দাঁড়াতেই, তার ডান চাকার তলায় আটকা পড়লো বিলাসের পাঞ্জাবীর পেছনের দিক্‌কার দোদুল্যমান প্রান্তটা।

এক মুহূর্তে হঠাৎ কি যে হয়ে গেল, ঠিক ঠাওর করতে না পেরে, দুই ফুটপাতের বিপুল জনতা তখন চতুর্দ্দিক থেকে ছুটে এসে ঘিরে দাঁড়ালো বিলাস আর সেই মোটর গাড়ীটাকে। তাদের মুখে তখন, "চাপা পড়লো"—"মারা পড়লো," রবের সে কি চীৎকার!

সহসা কিছু বুঝতে না পেরে বিলাস চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে, বিপুল জনতার সমাবেশ দেখে, লজ্জায় এবং ক্ষোভে তাড়াতাড়ি গা কাপড় ঝেড়ে উঠে বসবার চেষ্টা করলো। কিন্তু তাতে প্যাঁচ্ করে পাঞ্জাবীর প্রান্তটা মোটরের চাকার তলায় ছিঁড়ে রইল। টাল্ সামলাতে গিয়ে বিলাসকে আবার পড়তে হোলো মুখ থুবড়ে আছাড় খেয়ে।

আসলে দুর্ঘটনাটা বিলাসের মারাত্মক কিছুই হয় নি। কিন্তু নানা মানুষের নানারূপ সহানুভূতিতে বিলাস তখন কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল!

বিপুল জনতা মোটর আর বিলাসকে ঘিরে দাঁড়িয়ে তখন প্রশ্ন করতে সুরু করে দিয়েছে।

একজন বললেন,—"পা কি আপনার দু'খানাই চাপা পড়েছিল?"

কেউ বললেন,—"কোন হাতের কব্জিটা ভেঙ্গেছে মশাই?"

একজন অপর এক ভদ্রলোককে লক্ষ করে বললেন,—"কপালটা রীতিমত ফুটো হয়ে গেছে দেখছেন না? সাদা হাড় বেরিয়ে পড়েছে!"

একজন বললেন,—"চোখ ছুটো জড়িয়ে মুখটা একেবারে রক্তে লেপ্টে গেছে যে মশাই! চোখে লাগেনি তো?"

এক ভদ্রলোক বললেন,—"দেখুন দেখুন মাথায় চোট লেগেছে কি না?" পাশের এক ভদ্রলোক বিলাসের কাছে এগিয়ে এসে বিশুষ্ক মুখে বললেন,—"বাঁচবেন তো?"

এত লোকের এত কথার কি উত্তর দেবে বিলাস? সে শুধু সবাইকার কথা শুনছিল আর মাঝে মাঝে এর ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছিল। তারপর এক সময়ে বিলাস ভয়ানক বিরক্ত হয়ে, জনতার দিকে চেয়ে, বলে উঠলো,—"আমার কিছুই হয় নি—কোথাও চোট লাগে নি। আছাড় খেয়ে শুধু এই হাত আর কপালের খানিকটা জায়গা ছড়ে গেছে! দয়া করে আপনারা পথ ছাড়ুন—আমাকে যেতে দিন।"

বিলাসের কথা শুনে এক ভদ্রলোক প্রায় চেঁচিয়ে বলে উঠলেন,—"স্বচক্ষে দেখলুম লেগেছে! আর আপনি বলবেন লাগেনি?"

অপর একজন মন্তব্য করলেন,—"লেগেছে—লেগেছে ভয়ানক লেগেছে, ভদ্রলোক ভয়ে বলছেন না!"

কে একজন বক্তাদের বোগলের তলা দিয়ে মাথা গলিয়ে বলে উঠলেন,—"উনি না বললেই হবে? আমরা স্বচক্ষে দেখলুম লেগেছে। হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন নইলে কেস্ সিরিয়স্ হতে পারে।"

এক বেটি পানওয়ালী—বগলে একটা টিনের বাক্স আর

কাঁকালে পানের ঝুড়ি নিয়ে দূর থেকে বিলাসের দিকে উঁকি মেরেই বললো—"আহা কি সোনার চাঁদ ছেলে গো! রাস্তায় পড়ে প্রাণ যাচ্ছে, দেখবার লোক নেই! কে জানে কোন অভাগীর কপাল পুড়লো!" তারপর জনতার একটু কাছাকাছি এগিয়ে এসে, সে বোললো,—"আপনারা একটু ভিড় ছাড়ুন —না বাপু? মিনসের গায়ে একটু হাওয়া লাগুক!"

এক ভদ্রলোক তারই মধ্যে রাস্তা থেকে পুলিশ সার্জ্জেণ্ট ডেকে নিয়ে এলো। একজন গে'ল এ্যাম্বুলেন্সে টেলিফোন করতে।

সার্জ্জেণ্টের সামনে দাঁড়িয়ে একজন বিলাসকে প্রশ্ন সুরু করে দিল,—"আপনার নামটা কি মশাই?"

বিলাস—"শ্রীবিলাসচন্দ্র রায়। কিন্তু····· " অপর একজন বললেন,—"চুপ করুন। যা বলছি তার উত্তর দিন। আপনার বাসার ঠিকানা?"

বিলাস—"শ্যামবাজারের মোড়ে!"

সার্জ্জেণ্ট—"আই ডোণ্ট্ রিকোয়ার ছম্‌বাজার, টেল্ মি—দি রোড্ এ্যাড্রেস্!"

"—বি থার্টিন ক্যানেল পার্ক ওয়েষ্ট!"

সার্জ্জেণ্ট—উচ্চহাস্য করে বলে—"হুটস্ এ ভেরি আন্‌লাকি নাম্বার আই সি?"

সার্জ্জেণ্টের সম্মুখস্থ প্রথম ভদ্রলোক হাত মুখ নাচিয়ে সার্জ্জেণ্টকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন,—"কাঞ্চ্ ইউ সি?—দি

ম্যান হিমসেল্ফ ইজ আন্লাকি! হোয়াট্ টু স্পিক্ অফ্ হিজ হাউস?"

ভদ্রলোকের কথায় মজা পেয়ে সার্জ্জেণ্ট হোঃ হোঃ করে হেসে উঠে বললে—"রাইটো—রাইটো—করেক্ট ইউ আর—এক্জাকট্লি সো!"

বিলাসকে লক্ষ করে একব্যক্তি ভিড়ের ভেতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে এসে বললেন—"অতো কি লিখছেন মশাই আপনারা? হাসপাতালের ইমার্জ্জেন্সীতে পাঠিয়ে দিন—না ভদ্রলোককে; শেষে কি সেনস্লেস হয়ে পড়লে পাঠাবেন?"

সার্জ্জেণ্টের সম্মুখে দণ্ডায়মান বক্তাদের মধ্যে একজন বললেন—"উপদেশ তো দিচ্ছেন মশাই—লোক পাঠিয়েছেন এ্যাম্বুলেন্স ডাকতে?" অপর একজন সহানুভূতির ভঙ্গিতে বললেন—"যে রকমের টন্টনে জ্ঞান দেখছি ভদ্রলোকের, তাতে তেমন যে খুব একটা মারাত্মক আঘাত লেগেছে, তা কিন্তু মনে হচ্ছে না!" পেছন থেকে রুখে উঠে এক ভদ্রলোক তার উত্তর দিলেন "খুব মনোস্তত্বের থিয়োরী আওড়াচ্ছেন দেখছি? মাথাটা যে থেঁতলে গিয়ে রক্তের চাপ জমাট বাঁধতে সুরু করেছে তার কি করবেন?"

এমনি সময়ে একখানা এ্যাম্বুলেন্স এসে ভিড়ের সামনে দাঁড়ালো। সার্জ্জেণ্ট আর পূর্ব্ববর্ত্তি ভদ্রলোক দু'জন অগ্রবর্ত্তি হয়ে, বিলাসকে এ্যাম্বুলেন্সে তুলে দেবার জন্য এগিয়ে এলেন।

জনকয়েক হটাৎ জামার আস্তিন গুটিয়ে এ্যাম্বুলেন্সের

সামনে এগিয়ে গিয়ে চেঁচাতে সুরু করলেন—"এধার লে আও ট্রেচার এধার—"

শেষ পর্য্যন্ত তিন চার জনে ধরাধরি করে বিলাসকে সেই ট্রেচারে টেনে তুললো।

অপ্রস্তুতের মত বিলাস ফ্যাল ফ্যাল করে তাদের দিকে চেয়ে বলে ওঠে—"কেন আমাকে সং সাজাচ্ছেন স্যার?" হাসপাতালে যাবার মত কিছু তো হয়নি আমার! ছেড়ে দিন বাড়ী চলে যাই। শুধু শুধু আবার হাসপাতাল পর্য্যন্ত নিয়ে গিয়ে মিছেমিছি কেন আর ঝঞ্ঝাট বাড়াবেন? আমাকে ছেড়ে দিন।"

কিন্তু জনতা বিলাসের সে কথায় কর্ণপাত পর্য্যন্ত করলো না; তাদের নানা জনার মাথায় তখন নানা রকমের সহানুভূতির শাখা প্রশাখা, এমন গজিয়ে উঠেছে যে তারই মত্ততায় তাঁরা তখন শশব্যস্ত; সেখানে বিলাসের অনুরোধ শুধু অবান্তর নয় অপ্রীতিকর। শেষ পর্য্যন্ত ট্রেচারে উঠে বিলাসকে হাঁসপাতালেই যেতে হোল।

ব্যাপার দেখে কয়েকজন মেয়েছেলে অদূরের ফুটপাতের ওপরে দাঁড়িয়েই চোখের জল মুছতে মুছতে অনুশোচনার পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছিলেন। চোখের জল মুছতে গিয়ে একজন বললেন—"কি ডাকাতে সহর দেখ দেখি? জলজ্যান্ত মানুষটাকে একেবারে মোটর চাপা দিয়ে তবে ছাড়লে!" কেউ বললেন—"হাসহাতালের গাড়ীতে যখন তুলেছে তখন কি আর

ঐ মানুষের জীবনের আশা আছে ?" একজন আধাবয়সী মধ্যবিত্ত ব্যক্তি ফোঁস করে একটি দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করে বললেন, "মানুষের জীবন নিয়ে ছিনি মিনি খেলা যেন এযুগের একটা রেওয়াজ হয়ে উঠেছে। বাড়ীর লোক জানলে না, দেখতেও পে'ল না, হয়তো হাসপাতালেই লোকটার জীবনান্ত হবে! বলিহারি কাণ্ড-কারখানা!"

বিলাসকে এ্যম্বুলেন্সে তোলা হলে—এক ভদ্রলোক ট্রামে করে ছুটলেন তার বাড়ীতে খবর দিতে। জন দুই যুবক সত্য প্রবৃত্ত হয়ে বিলাসের পাশে এম্বুলেন্সে উঠে বোসলো। গভীর সহানুভূতির ফাঁদে আটকা পড়ে বিলাসের আকস্মিক দুর্ঘটনটা তখন নিদারুণ দুর্ভাবনায় রূপান্তরিত হয়েছে। নিরুপায় বিলাস তখন শেষ বারের মত অস্ফুটে একবার বলে উঠলো— "দেখুন দেখি কি কেলেঙ্কারীটা আপনারা করলেন ?" সে কথার প্রতিবাদ কিম্বা প্রতিউত্তর কেউ কোরলো কি কোরলো না— সেটা গাড়ির শব্দেই চাপা পড়ে গে'ল। এ্যম্বুলেন্স তখন হু-হু-শব্দে হাসপাতালের দিকে ছুটে চলেছে।

আট

—"বউদি—ও বউদি! টেলিফোন এসেছে—টেলিফোন!" বলেই মিনা মাধবীর দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগলো।

"একি—তুমি অমন করে হাঁপাচ্ছ কেন? টেলিফোন হাসপাতাল থেকে বুঝি?—কোন হাসপাতাল মিনা? আমায় গোপন কোরো না লক্ষ্মীটি!"

মিনা নিজেকে ততক্ষণে অনেকটা সামলে নিয়েছে—ভেতরে ঢুকে চেয়ারে উপবেশন করে সে তখন বলে,—"আপনি কি করে আগে জানলেন?"

—"কিছুই জানিনে—শুধু মনটা বড্ড চঞ্চল হয়েছে বলেই বললুম! মিনা, উনি বাঁচবেন তো?" মাধবীর চক্ষু সজল হয়ে উঠলো।

—"কি মুস্কিলেই পড়লুম রে বাবা! এইমাত্র দাদা আমায় ডেকে বললেন—সরোজ. সেবাসদন থেকে টেলিফোন এসেছে, বিলাসবাবুকে এম্বুলেন্সে করে হাসপাতালের ইমার্জ্জেন্সীতে নেয়া হয়েছে। ওঁকে আজ হাসপাতাল থেকে ছাড়া হবে না। বাড়ীর লোক দেখতে চাইলে এসে দেখে যেতে পারেন। এ্যক্সিডেন্ট কি মানুষের হয় না? তাতে না বাঁচবার কি হোল?"

—"কিন্তু কি করে তাঁকে দেখতে যাবো মিনা? একটিবার

তাঁকে স্বচক্ষে না দেখতে পেলে তো আমি সুস্থ হয়ে চলাফেরা করতে পারবো না ভাই ?”

—“তা চলুন না এই তো সবে বিকেল ছ’টা। গাড়ী করে আমরা পনর মিনিটের ভেতরেই হাসপাতালের ইমার্জ্জেন্সীতে পৌঁছে যাবো।”

গভীর বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে, করুণ মিনতির সুরে মাধবী সহসা চোখ মুছতে মুছতে ব’লে ওঠে,—“চ’ল যাচ্ছি; পূর্ব্বজন্মে তুমি আমার কে ছিলে জানিনে। সত্যিই তোমার দাদা অত্যন্ত মহানুভব, নইলে কার বিপদে কে আর কার নিজের গাড়ীর পেট্রল পুড়িয়ে পরের উপকার করে ? অথচ এখনো তোমাদের কাছে আমাদের তিন মাসের ভাড়া বাকী।”

হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়িয়ে মিনা বলে—“তার ওপরে আবার আজকের এই হাসপাতালে যাওয়ার পেট্রোলের খরচ লেডি-ড্রাইভারের বকশিস—এই সব যোগ করতে হবে তো ?” তারপর ছুটে নীচের দিকে নামতে গিয়ে বলে—“আমি গাড়ীটা বের করিয়ে আসছি, আপনি তৈরী হয়ে নিন্।”

* * *

উপর থেকে ধীরেনবাবু চেয়ে দেখলেন—সোফারকে পেছনের সিটে বসিয়ে, মিনা তার পাশে মাধবীকে নিয়ে হাসপাতালের দিকে রওনা হয়ে গেল। চিত্রার্পিতের মত সেইদিকে কিছুক্ষণ

দাঁড়িয়ে দেখে তেতলার গাড়ীবারান্দা দিয়ে ধীরেনবাবু নিজের কক্ষে প্রবেশ করলেন। এতদিন এ বাড়ীতে বিলাস রয়েছে কিন্তু কোনদিনই তার স্ত্রী মাধবী দেবীকে আজকের মত এত পরিষ্কারভাবে দেখবার সুযোগ তাঁর হয়নি। বয়সের তুলনায় মিনতীর চাইতে মাধবী ছোট নয়, কিন্তু মাধবীর যে চেহারা আজ ধীরেনবাবু দেখলেন,—তাতে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন! সুপ্রিয়ার চাইতেও মাধবীর রূপঐশ্বর্য্য প্রচুর এবং গাম্ভীর্য্যেমণ্ডিত—এটা তিনি সহজেই আবিষ্কার করে ফেললেন। অনিন্দসুন্দর মুখের দু'টি বিনম্র আঁখি থেকে উদ্বেগ আর ব্যাকুলতা যেন মাধবীর ঝরে পড়ছিল। ছবিখানি তখনও ধীরেনবাবুর চোখের সম্মুখে ভাসছে। মাধবীর এই মুখ যে ধীরেন বাবুর কাছে আজ কত পরিতৃপ্তিকর লাগলো তা শুধু মনে মনেই তিনি উপলব্ধি করলেন। ধীরেনবাবু বিলাসকে সত্যিই একজন ভাগ্যবান ব্যক্তি বলে আজ মনে স্থান দিলেন। অন্যমনস্কের মতন উদাস দু'টি চক্ষু বইয়ের দিকে মেলে কত কথাই না ধীরেনবাবু আজ ভাবলেন! মিনতীর কোনও সন্তান আজ পর্য্যন্ত হোল না, হয়তো সন্তানের জননী সে হতেও পারবে না। তার একটা ব্যথা ধীরেনবাবুকে আজও আচ্ছন্ন করে রেখেছে। মিনতীকে মানুষ করার চেষ্টা করে, লেখাপড়ার দিকে এগিয়ে দেবার জন্যও তিনি যত্নের ক্রুটী করেন নি। কিন্তু মিনতী তা কোনদিনই বরদাস্ত করেনি,—সেখানেও ধীরেনবাবুর মনে একটা বিরাট ক্ষত পক্ষাঘাতের মত তাঁর হৃদয়ের আশা ও আনন্দকে অবশ

করে রেখেছে। ধীরেনবাবু জানেন মিনতীর বাপের বাড়ীতে পড়ে থাকবার মত সংগতি নেই, কিন্তু তবুও সে—যে কোনও একটা অশান্তির সূত্র ধরে অনাহুত বাদ্‌বিতণ্ডার সৃষ্টি করে বাপের বাড়ী চলে যায়। আজ পাঁচ দিন অতিবাহিত হতে চললো দেখে এ যাত্রায় তিনি একটু আশ্চর্য্যই বোধ করছেন। এই মিনতীর পাশে মাধবীকে দাঁড় করাতে গিয়ে সহসা ধীরেনবাবু যেন সঙ্কুচিত হয়ে পড়লেন। বাবা যা রেখে গেছেন তাই থেকেই তার এই ক্ষুদ্র সংসার অতি স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারতো। কিন্তু তবুও তাঁকে চাকরী করতে হয় শুধু বোধ করি নিজের জীবনটাকে ভুলে থাকবার জন্য। এক্ষেত্রে নিজের চরিত্রকে বাজী রেখে তিনি কোনদিনই চরিত্রহীন সাজবার চেষ্টা করেন নি। বন্ধুবান্ধবেরা সে জন্য তাঁকে যথেষ্ট ঠাট্টা তামাসা করেছে। এমেচার ক্লাবে নিয়ে কত জন তাঁকে দলে ভেড়াবার চেষ্টা করেছে। সন্ধ্যার পর যারা ফুল-কুমারের বেশ ধারণ করে চক্ষে রঙের সুর্মা লাগিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াতে ভালবাসে তাদের পাল্লায় পড়েও ধীরেনবাবুকে জীবনে বহুবার অতিষ্ঠ হয়ে উঠতে হয়েছে, কিন্তু তবুও তাঁর বন্ধুবান্ধবেরা কোনদিনই পারলো না তাঁকে তাঁর সঙ্কল্প থেকে একচুলও নড়াতে। স্বইচ্ছায় কাউকে কিছু বিলিয়ে দেওয়া যেমনি ধীরেনবাবু পছন্দ করেন না, তেমনি আবার কেউ সত্যিকারের কোনও অভাব অভিযোগের ফিরিস্তি নিয়ে এলে প্রয়োজনের অনুপাতে তাঁকেও তিনি সাহায্য না করে

থাকতে পারেন না। মিনতীকে বিবাহ করবার পর থেকে ধীরেন-বাবুর জীবনের স্ফুর্ত্তি এবং উচ্ছসিত আকাঙ্খ্যা তাঁর হৃদয় থেকে চির বিদায় নিয়েছে, এইটেই তাঁর জীবনের চরম ট্র্যাজিডি। মাধবীকে চাক্ষুষ দেখতে পেয়ে ধীরেনবাবুর মনে আজ এমনি সব চিন্তার আনাগোনা হচ্ছিল। সহসা তাঁর পরিসমাপ্তি ঘোটলো তাঁর পুরাতন ভৃত্য নন্দত্নলালের ডাকে।

নানা চিন্তার বেড়াজাল থেকে সাময়িক মুক্তি পেয়ে তিনি ভৃত্যকে প্রশ্ন করলেন—"কেউ ডাকছে আমায় নন্দ?" কঠিন নিকষ কালো একখানি পাথর খোঁদাই করা নিরেট একটি মানবদেহধারী পশু যেন এই নন্দ ত্নলাল। ধীরেনবাবুর একমাত্র শ্যালক ন্যাড়ার সঙ্গে এর চরিত্রের একটা বিশেষ মিল যেন কোথায় রয়েছে। ওকে দেখলেই ধীরেনবাবুর হাসি পায়। ওর বাপ মরবার সময় দশ বৎসরের বালক নন্দকে ধীরেনবাবুর আশ্রয়ে রেখে যায়। সেই থেকেই ও ধীরেনবাবুর আশ্রয়ে লালিত পালিত। এখন ওর বয়স প্রায় আঠারোর কাছাকাছি কিন্তু স্বভাব এতটুকুও বদলায় নি, আর সেইটুকুই হচ্ছে ধীরেন বাবুর অবসর বিনোদনের একমাত্র ভরসাস্থল। পৃথিবীর কোন লোকের সঙ্গেই নন্দত্নলালের কোনও আলাপ পরিচয় নেই। বাড়ীর ভেতরে সে একমাত্র ধীরেন বাবু ছাড়া আর কারো কথাও তেমন শোনে না। যে জন্য তার বিরুদ্ধে একটা না একটা নালিশ বাড়ীতে রোজ লেগেই আছে। ধীরেন বাবু তা থেকেও প্রচুর হাসির খোরাক

প্রতিনিয়তই সংগ্রহ করে থাকেন, অথচ সেজন্য উৎকট সাশন কিম্বা পীড়ন কোনটাই তিনি নন্দদুলালকে করেন না। মিনা আর মিনতী কিন্তু ধীরেনবাবুর এই নন্দর সঙ্গে প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধটা আজ পর্য্যন্তও ঠিক উপলব্ধি করে উঠতে পারে নি।

"—কিরে কথা বলছিস্ না যে? কেউ ডাকছে আমাকে?" ধীরেনবাবু আবার প্রশ্ন করেন।

নন্দ উত্তর দেয়—"কইল্যাম যে! বাবু আইছে দুইড্যা! একটার হাতে এট্টা মোটা ব্যাতের লাঠী আর এট্টার গলায় হইল রবারের নল তার দুইধারে দুইড্যা চুঙ্গা!"

—"সে তো বুঝলুম—কিন্তু কি বললেন তোকে তাঁরা? আমার সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছেন—তো নিয়ে এলি না কেন ওপরে?"

—"হুঃ—সামনে যাইত্যে না যাইত্যেই তাইড়্যা আসে লাঠী লইয়্যা মারতে! আবার আমারে কয় তুমি কেডা? যত কই নন্দদুলাল তত কয় তোমার বাবুরি ডাকো! আমার বাবুর দায়ড্যা পড়ছে কি তার কাছে যাওনের? তারা আইথে পারে না?"

এমনি সময়ে ধীরেন বাবুর কক্ষের দরজায় রেবতীবাবু এসে উপস্থিত হলেন সঙ্গে ক্ষীরোদ ডাক্তার। ধীরেন বাবুর দিকে চেয়েই রেবতী বাবু বলে উঠলেন,—"এই যে আমরা নিজেরাই এসে উঠলুম আপনার তেতলা পর্য্যন্ত সে জন্য বেয়াদবি মাপ করবেন!"

ব্যতিব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়িয়ে ধীরেন বাবু বললেন,—

"তাতে কি হয়েছে? আসুন আসুন আজ যে আমার পরম সৌভাগ্য দেখতে পাচ্ছি! এই সন্ধ্যা রাত্রিতে গরীবকে হঠাৎ কি মনে করে? দাঁড়িয়ে রইলেন যে—বসুন না আপনারা!

—ওরে নন্দ খান তুই চেয়ার নিয়ে আয় তো মিনার ঘর থেকে!"

চেয়ারে উপবেশন করে রেবতীবাবু সুরু করলেন,—আপনার "বাড়ীটা আজ বড্ড ফাঁকা ফাঁকা লাগছে না?"

মুচ্‌কি হেসে ধীরেনবাবু উত্তর দিলেন,—"হ্যাঁ খানিকটা ফাঁকা ফাঁকাই বটে! কেউ গেছেন বাপের বাড়ী, কেউ গেছেন হাসপাতালে।"

"হাসপাতালে! কেউ অসুখ বুঝি? কোন্ হাসপাতালে?"

—"সরোজ সেবা সদনে। একটু আগেই সেখান থেকে ফোন এসেছিল—আমার নীচেকার ভাড়াটে ভদ্রলোকের এ্যাক্‌সিডেন্ট হয়েছে বলে। আমার ভগ্নী মিনাও তাদের সঙ্গেই গেছে! তারপর আপনার খবর কি বলুন" বলে ধীরেনবাবু উৎসুক নয়নে ক্ষীরোদ ডাক্তারের দিকে একবার চাইলেন।

চশমাটা পরিষ্কার করে নিয়ে রেবতীবাবু একটু গুছিয়ে বসলেন। তারপর বললেন—"এই সন্ধ্যা রাত্রিতে যে আসতে পারলুম এওতো হয়ে ওঠেনা ধীরেনবাবু। কবে সেই ব্যাঙ্কে গিয়ে আপনাকে বলেছি অথচ দেখুন এসে উপস্থিত হলুম কবে!"

—"তা-অমন হয়! আপনার তো আর একটা কাজ নয়,

কতদূর এগিয়ে নিলেন হাসপাতালের কাজ? কি নাম যে'ন হাসপাতালটির সেদিন বল্‌ছিলেন?"

—"একটু আগে তো আপনার মুখেই তার নাম উচ্চারণ হ'ল!" বলেই রেবতীবাবু একগাল হাসলেন।

ক্ষীরোদ বললো—"সরোজ সেবা সদন!"

অতিরিক্ত মাত্রায় বিস্মিত হয়ে ধীরেনবাবু বললেন—"ও—তাই নাকি? এ্যারেঞ্জমেণ্টতো তা'হলে এরি মধ্যে আপনারা কম করেন নি? আপনিও বুঝি ওখানকার একজন ডাক্তার?"

ক্ষীরোদ ডাক্তার একটু হেসে শুধু রেবতীবাবুর দিকে মুখ তুলে চাইল।

ক্ষীরোদের হাসি দেখে রেবতীবাবুও একটু হাসলেন। তারপর ধীরেনবাবুর দিকে চেয়ে বললেন—"ওর কথাই সেদিন আমি আপনাকে বলছিলুম। উনিই হচ্ছেন ডাক্তার ক্ষীরোদ কুমার চৌধুরী!"

কথা শুনে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি ধীরেনবাবুর মুখ থেকে বেরিয়ে পড়লো—"ইনিই জার্ম্মাণ ফেরৎ ডক্টর কে. চৌধুরী? এত অল্প বয়সে এত বড় মেণ্টাল স্পেশালিষ্ট ডাক্তার হয়ে এদেশে ফিরে, এমনি নিঃস্বার্থভাবে পরোপকারে ব্রতী হয়েছেন?" তারপর ধীরেনবাবু নন্দদুলালকে ডেকে চা এবং জলখাবার আনতে পাঠালেন।

রেবতীবাবু বললেন—"জ্ঞানী এবং গুণীর মূল্য এদেশের লোক আজও দিতে শেখেনি ধীরেনবাবু! ওতো ডাক্তার ওর

কথা ছেড়ে দিন! এই দেশের মুক্তির জন্য আমরা কোন্ মহা বিপদ ঘাড়ে নেইনি বলতে পারেন? সেই ইংরেজ জাতকে বাধ্য তো করেছি দেশ ছেড়ে যেতে? কিন্তু তা করলে কি হ'বে! কংগ্রেসের ভেতরে যে দলাদলি আজ সুরু হয়েছে তার পরিসমাপ্তি ঘটতে কত বৎসর এই দেশের লোককে আরো কত খেসারত দিতে হয় তাই আগে দেখুন!"

"আপনি কি বলছেন বর্ত্তমান কংগ্রেস, ইংরেজের হাত থেকে শাসনভার হাতে নিয়েও ভারতবর্ষের সুখ-সম্পদ ফিরিয়ে আনতে পারবে না?"

—"হয়তো পারতো! কিন্তু একদিকে যেমন এদেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবার দলের অভাব নেই, অন্যদিকে নেই তেমনি রাজনীতি পরিচালনা করবার সুস্থ মস্তিষ্ক! হুজুগে মেতে একটা সাময়িক জেদ বজায় রাখবার জন্য অকাতরে জীবন বিসর্জ্জন দেবার মানুষের অভাব এদেশে কোনকালেই নেই, কিন্তু শান্ত মনে, স্থির মস্তিষ্কে, এমনি একটা বিভিন্ন মতাবলম্বী ছত্রিশ সম্প্রদায়ের দেশে, রাজনীতি পরিচালনা করবার লোক দেখতে পাচ্ছেন কি আপনারা একটিও?"

"তাতো বটেই," বলে ধীরেনবাবু সুরু করলেন—"ইন্‌ডিপেন্‌ডেন্স্ ডে তো ক্রমেই এগিয়ে আসছে। কার হাতে দেশ শাসনের বড় দায়ীত্বের ভার পড়বে শুনতে পাচ্ছেন কিছু?"

—"শুনে আর কি হবে? দেখতেই তো পাবেন সব দু'দিন

পরে। আচ্ছা এখন আমাদের সরোজ সেবা সদনের কয়টা কথা এবং কাজটুকু সেরে আমরা উঠে পড়তে চাই।"

এমনি সময়ে নন্দ দু'বাটি চা এবং দু'প্লেট জলখাবার এনে ক্ষীরোদ ডাক্তার এবং রেবতীবাবুর হাতের কাছে টেবিলে রেখে গে'ল।

দক্ষিণ হস্তের কাজ সুরু করে দিয়ে রেবতীবাবু বললেন,—"সেদিন আমি শুধু এই ডাক্তারের বিদ্যাবুদ্ধি ধৈর্য্য এবং কর্ম্ম-কুশলতার পরিচয় আপনাকে দিয়েছিলাম। আজ শুনে রাখুন ইনি হচ্ছেন আমার বাল্যবন্ধু সরোজ রায় চৌধুরীর একমাত্র সুযোগ্য পুত্র!"

—"কোন্ সরোজ রায় চৌধুরী বলুন তো?"

—"ব্যারিস্টার সরোজ রায় চৌধুরী যাঁর ব্যারিস্টারীর যশ এবং অর্থের প্রাচুর্য্য এ সহরের কারো সঙ্গেই আজ আর তুলনা করা চলে না! অথচ সেই সরোজ তার এই ছেলের মেণ্টাল হাসপাতালের জন্য এতটুকুও সাহায্য করতে অগ্রসর হয়ে এলোনা!"

—"সে কি রেবতীবাবু! সরোজবাবু তো শুধু ব্যারিস্টারই নন! তিনি যে মস্ত জমিদার? অন্ততঃ আমার তো এটুকু জানা আছে, আজ এ সহরের যে কয়টা বড় ব্যাঙ্ক রয়েছে তার কোনটাতেই সরোজবাবুর বড় কম টাকা ডিপোজিট নেই! আমার তো মনে হয় সরোজবাবুর জমানো টাকার সুদ থেকেই আপনাদের ঐ হাসপাতাল অতি স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারে,

উপরন্তু আরো অনেক কিছু করা যায়। তাঁর মতন ধনবান ব্যক্তি এমন একটা জনহিতকর কার্যের প্রতি বিরূপ হবার কারণটা তো সত্যিই একটু রহস্যময় বলেই মনে হচ্ছে!"

—"রহস্য যে কিছুটা রয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই!— তিনি চেয়েছিলেন ছেলের রোজগারের জন্য একটী চেম্বার খুলে দিতে; নয়তো ভারত গভর্ণমেণ্টের কাছে চাকরী করাতে! ছেলের উচ্চশিক্ষার জন্য টাকা তিনি অকাতরে খরচ করে-ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই; কিন্তু তাই বলে, সরোজ এটা চায়নি যে—তার ছেলে গোড়াতেই অর্থ রোজগারের কথা ভুলে এই ভূতুড়ে দেশের মানুষের সুচিকিৎসার জন্য ডোনেশন তুলে চ্যারীটেবল ডিস্‌পেনসারী নিয়ে অকারণে খেটে মরবে। বুঝিয়ে-ছিলুম তাকে আমি অনেক, এবং ক্ষীরোদের পক্ষ নিয়েই বলেও ছিলুম—কিছু টাকাকড়ি সাহায্য করবার জন্য; কিন্তু তাতে সরোজ শুধু মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিয়ে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে আমাকে বলেছিল—'নিজে তো কংগ্রেস করে দেশকে উদ্ধার করে দিলে—ওর পেছনে উসকানি দিয়ে আবার আমাকে ব্যতিব্যস্ত করা কেন?" সেই থেকে সরোজের কাছে যাতায়াত করাই আমার বন্ধ করে দিতে হয়েছে। ক্ষীরোদকে দেখ্‌ছি একটা সত্যিকারের ভালো কাজে লেগেছে! কাকাবাবু বলে ডাকে, তা ছাড়া এ পোড়া দেশে এ রকমের হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হলে যে কত গরীবের উপকার হবে তার ইয়ত্তা নেই! তাতেই ওর হাসপাতালের কিছুটা কাজ আমাকে বাধ্য হয়েই

করতে হচ্ছে। দেশের এই কাজের জন্য যদি আপনারাও আন্তরিক সাহায্য করেন, তাহলেই সরোজও একদিন বুঝতে পারবে তার ভুল।"

—"সে তো নিশ্চয়ই—আমাদের আর শক্তি কতটুকু ? তবুও তারি ভেতরে, যতদূর সম্ভব আমি তা করবো ;—অধিকন্তু আমার পরিচিত ধনী বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে যতটুকু সাহায্য আমি আপনাদের হাসপাতালের জন্য ব্যবস্থা করতে পারি, সে চেষ্টারও বিন্দুমাত্র ত্রুটী হবে না !"

ধীরেনবাবুর কথা শুনতে শুনতে উঠে দাঁড়িয়ে ক্ষীরোদ ডাক্তার বলে,—"আপনার এই প্রতিশ্রুতিই আমার কাছে যথেষ্ট।" তারপর রেবতীবাবুর দিকে ফিরে চেয়ে সে বোললো— "চলুন কাকাবাবু রাত হয়ে যাচ্ছে হাসপাতালেও একবার যেতে হবে।"

উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে রেবতী বাবু বললেন—"যেদিক থেকে যতটুকু পারেন তাই করবেন তা হলেই হাসপাতালের মারফতে দেশের লোকের প্রচুর উপকার করা হবে !"

প্রতি নমস্কার জানাতে জানাতে ধীরেনবাবু উত্তর দিলেন,— "আমাকে আর অযথা লজ্জা দেবার চেষ্টা করবেন না ! এ কাজ তো আপনাদের একলার নয়, এ যে আমারো কাজ সে কথা তো ভুলতে পারবো না রেবতীবাবু।"

ক্ষীরোদ ডাক্তারকে নিয়ে রেবতী বাবু চলে যাবার কিছুক্ষণ পরই নীচে গাড়ীর শব্দ পেয়ে ধীরেন বাবু তেতলা থেকে ঝুঁকে

দেখলেন—বিলাসকে নিয়েই এঁরা গাড়ী থেকে নামছেন। মনে হ'ল যেন বিলাসের কপাল জুড়ে একটা বিরাট ব্যাণ্ডেজ বাঁধা রয়েছে!

মাধবী দেবী ও বিলাস অরুণকে নিয়ে দোতলায় তাদের ফ্লাটে প্রবেশ করতেই মিনা বরাবর তেতলায় উঠে গিয়ে ধীরেন বাবুর কক্ষে প্রবেশ করলো।

মিনার অপেক্ষাই করছিলেন এতক্ষণ ধীরেন বাবু। তাকে কক্ষে প্রবেশ করতে দেখেই এগিয়ে এসে তিনি প্রশ্ন করলেন,—"বিলাস বাবু কি ফিরে এলেন ?"

"হ্যাঁ! শুধু হাতের কনুই আর কপালের খানিকটা জায়গা রাস্তার পিচের ওপরে আছড়ে প'ড়ে ছ'ড়ে গিয়েছিল—আর কিছুই হয় নি!"

বোনের কথা শুনে ধীরেনবাবু অনেকক্ষণ পরে যেন বুকের রুদ্ধ নিশ্বাস মোচন করে বাঁচলেন। বললেন—"যাক তাই ভালো! খুব বাঁচা বাঁচলেন—তা হলে ভদ্রলোক!" তারপর তিনি সুস্থ হয়ে চেয়ারে বসে বাইরের দিকে চেয়ে বললেন। "হাসপাতালটা কেমন দেখলে মিনা ?"

পায়ের জুতোটা খুলতে খুলতে মিনা বলে—"ভারি চমৎকার দাদা! বিলাসদার কি-ই বা দুর্ঘটনা হয়ে ছিল? তার জন্য তাকে নিয়ে সেকি যত্ন! আমরা যেতেই আমাদেরি না কত আদর যত্ন দেখালে! আমরা না গেলে বিলাসদাকে আজ ওরা হাসপাতাল থেকে কিছুতেই ছাড়তো না! নার্স

ডাক্তার গুলোই না কি চমৎকার! দেখলেই ভক্তি হয়। ডাক্তার ঘোষ ব'লে এক ভদ্রলোক বৌদির সঙ্গে কত কথা বোললেন। আমার এতো ভালো লাগলো শুনে যে তা বোললে ফুরোয় না! শুনলুম কে এক জন-মস্ত বড় লোকের ছেলে ডাক্তার কে. চৌধুরী নাকি ঐ হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি নিজেই সব দেখাশুনা করেন।"

—হাসতে হাসতে ধীরেন বাবু বললেন—"দেখা হ'ল তাঁর সঙ্গে তোমাদের?"

—"না হয়নি তো! আমরা যে সময়ে গিয়েছি শুনলুম ঐ সময়ে প্রায় দিনই তিনি হাসপাতালে থাকেন না। কিন্তু ডাক্তার ঘোষ বললেন তিনি নাকি ঐ হাসপাতালেই রাত্রিযাপন করেন!"

মুচকি হেসে ধীরেনবাবু বললেন—"এই তো তোমরা আসবার একটু আগেই তিনি এখান থেকে চলে গেলেন।"

—"কে?—ডাক্তার কে. চৌধুরী? সত্যি তিনিই তোমার কাছে এসেছিলেন! কেন দাদা তিনি এসেছিলেন? তবে কি ব্যাঙ্কে···" "—না রে—না! হাসপাতালটার উন্নতির জন্য আমার বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে কিছু ডোনেশন ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করতে এসেছিলেন। ডাক্তারী পড়বার ইচ্ছে যদি থাকে তবে ব'ল আমি ঐ হাসপাতালে তোমার পড়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।" মিনা বলে—"আমি এক্ষুনি রাজি!"

ওদিকে ঘরে ঢুকেই বিলাস বললো—"দাঁড়াও আগে সুস্থ হয়ে বসতে দাও। চেঁচামেচি করো না—কিচ্ছু হয়নি আমার!" মাধবীর চোখে তখন জল এসে পড়েছে, বললো—"দরকার নেই তোমার কাল থেকে বাইরে বেরিয়ে! নিশ্চয়ই গাড়ী চাপা পড়েছিলে! কো'ন জায়গা ভেঙ্গে টেঙ্গে যায়নি তো? হাতটা তো নিশ্চয় মস্কে গেছে—দেখতেই পাচ্ছি!"

বিলাস দুহাত নাচিয়ে বলে উঠলো—"দেখ, বেলা পাঁচটা থেকে রাস্তার লোকগুলো আমার পেছু নিয়ে—হাসপাতালের ইমার্জ্জেন্সী ডিপার্টমেণ্ট পর্য্যন্ত ঢুকিয়ে তবে ছেড়েছে। যদি বা কোন মতে হাসপাতালের হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে বাড়ী ফিরলুম,—তুমি দেখছি আবার সুরু করলে?"—

"তার মানে তোমার কিছুই হয় নি? আর দুনিয়ার যত লোক তাদের তো আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, কোথায় তারা তোমার ভাল করলো—না তারাই হোল তোমার সব শত্রু?"

গায়ের জামাটা খুলতে খুলতে বিলাস বললো—"না সবাই আমার মিত্র আর তুমি হলে তার জ্বলন্ত চিত্র!"

—"কি হয়েছিল বল না শুনি? কোথাও সেঁক টেক কিছু করতে হবে না তো? খাবার ঔষধ কোথায়? আমারও মনে পড়লো না তখন, কিন্তু কি হবে তা'হলে?" মহা অসহায়ের মত কাতর অথচ বিরক্তির সুরে বিলাস বললো, "কুইনাইন নিয়ে এসো! আর নিয়ে এসো তোমার যা যা যন্ত্রপাতি আছে! তারপর তুমি আবার একবার ডাক্তারী সুরু করে দাও! উঃ—

কি কুক্ষণেই আজ ঘুম থেকে উঠেছিলুম! শেষকালে ব্যাটারা আমাকে চিকিৎসা শঙ্কটের নন্দ বানিয়ে তবে ছাড়লে? ধন্যি সহর বাবা কলকাতা! পেন্নাম হই!”

—“চিকিৎসা সঙ্কটের নন্দ মানে? হয়েছিল কি তোমার?”

—“আরে হয়েছিল ছাই। পায়ের জুতোর তলায় আমের ছিবড়ে পড়ে পা পিছলে আছাড় খেয়েছিলুম, আর ঠিক সেই সময়েই আমার গা ঘেঁসে একটা মোটর এসে দাঁড়িয়েছিল। আর যাবে কোথায়? এককাড়ি লোক এসে চেঁচামেচি সুরু ক’রে দিল! যত বলছি আমার কোথাও লাগেনি, তত সেই বিরাট জনতা-পারে তো আমায় মারে আর কি? সাধে আর বলেছে দশচক্রে ভগবান ভূত! হাসপাতাল অবধি নিয়ে তবে বেটারা আমায় ছাড়লে?”

—“মোটর তোমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছিল কেন?”

—“জিজ্ঞেস্ করে এসো গিয়ে সে কথা—সেই মোটর ড্রাইভারকে; আমি কি জানি?

সাধে আর রাবীন্দ্রিক ছন্দে বলতে সাধ হয়!

ধন্য তোমারে হে মহা নগরী
চরণ পদ্মে নমস্কার,
দাও ফিরে মম সাবেক দেহটী
লহ ব্যাণ্ডেজ পুরস্কার।”

—“ওমা এরই মধ্যে তুমি ব্যাণ্ডেজগুলো খুলছো যে গো?”

—“ঘুমুতে হবে না? তুমিও কি আমাকে পাগল পেলে নাকি?

মাঝখান থেকে ডাক্তারগুলো বাঁ হাতটায় একটা সূঁচ ফুটিয়ে দিয়ে এমন ব্যথা করে দিলে, যে, এখন এই সুস্থ শরীরে বসে বসে নুনের সেঁক না দিতে হলে বাঁচি !”

—“হাতে অত বড় একটা খাম কিসের গো ? ওটা কোথা থেকে এনেছ ?”

—“দাঁড়াও ! সেই কথাই তো বোলবো ! চাকরি ! চাকরি ! রেডিমেড্ চাকরি। নগদ দু'শো টাকা মাইনে ! অথচ কিছুই করতে হবেনা বুঝলে ? স্রেফ্ পলিসি বেচে দিলেই হোল ! জগৎটাই হচ্ছে শুধু পলিসি আর পলিসি।” তারপর বিলাস হাসতে হাসতে বোল্লো, “ওঃ—তুমি যদি শুনতে সেই ভদ্রলোকের কথা, তো হেসেই খুন হ'তে ! বল্লে কি জানো ? ডিক্সনারীর বাছা বাছা সব কথা—”

“Charity begins at Home.”

“Try your next door neighbour.”

মাধবী হাসতে হাসতে প্রশ্ন করে,—“তার মানে ?”

—“আঃ সব কথারই মানে শুনতে চাও কেন ? দাঁড়াও না ভদ্রলোকের ‘charity begins at home’ কে আমি কালকেই ধরছি গিয়ে ঘেচাং করে ; আপত্তি তুল্লেই বলবো আপনি আমার next door neighbour. Policy কিনুন ! দু'দিন পরেই তো বাড়ী ভাড়ার তাগাদা করতে ছুটে আসবেন, Policy না কিনলে টাকা দেবো কোথা থেকে ?”

—"কি-যে হেঁয়ালি আরম্ভ করেছ! কে তোমার next door neighbour? পলিসি আবার কিনবে কি?"

—"আঃ—হা হা, সোজা কথাটাও বুঝলে না? Insurance policy. আর সেটা করাবো প্রথমেই আমাদের ধীরেনবাবুকে?"

—"তাঁর বয়ে গেছে তোমার কাছে Insurance করতে! তাঁর বুঝি Life Insurance করা নেই তুমি মনে করেছ?"

—"অধিকন্তু নঃ দোষায়? চ'ল খেতে দেবে!"

—"তুমি কি আবার রাত্রে খাবে? উপোস করলে হতো না? ব্যথা বিষগুলো তা হলে কমতো!"

—"বলছি আমার দেহের ত্রিকূলে নেই ব্যথা বিষ। আর অমনি তুমি বার্লি পথ্য দেবার ব্যবস্থাটা পর্য্যন্ত বাদ দিয়ে—একেবারে উপোসের অবস্থা করলে? আচ্ছা গিন্নী তুমি যা হোক্! চল?"

—"আমি ঠাট্টা কচ্ছি না, তুমি বরং এক কাপ চা খেয়ে থাকো!"

—"ওর চাইতে তো দেখছি হাসপাতালই ছিল ভালো—ওরা তবু একবাটী গরম দুধ খাইয়েছিল। তা হলে সেই-খানে থাকলেই তো পাত্তুম? কে তোমাকে ধীরেনবাবুর গাড়ির পেট্রোল পুড়িয়ে সেখানে যেতে বলেছিল?"

—"তবে খাবে চ'ল আমার কি? অসুখ বিশুখ হলে নিজেই ভুগবে!"

"এই তো প্রেয়সীর মত কথা? চ'ল—চ'ল। উঃ কি তাজ্জব

সহর কলকাতা! কলম পিষে আর দশটা ছ'টা চাকরী করে সহরটার চেহারাই প্রায় ভুলে গিয়েছিলুম, বাপ্‌স্!—নাও শীগ্‌গির চল!"

নয়

গড়িয়াহাটার বর্দ্ধিষ্ণু পল্লির অনতিদূরে একটী নিরালা বড় ল্যাণ্ডের ওপর বিখ্যাত ব্যারিস্টার সরোজ রায় চৌধুরীর প্রকাণ্ড বাড়ীটা সহজেই পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঝি, চাকর, দ্বারোয়ান আর স্ত্রী লতিকাকে নিয়েই তাঁর শেষ জীবনের দিনগুলি যেন ঢিমে তালে চলতে সুরু করেছে। সুসজ্জিত প্রাসাদ সমতুল্য এমন যার বাড়ী, তিনটী বিলিতি ব্যাঙ্কে কম পক্ষেও যার প্রায় আট-দশ লক্ষ টাকা লগ্নী কারবারে খাটছে;—হাঁক্ করতেই যার দাস দাসী চাকর চাকরানী ব্যস্ত সমস্ত হয়ে কাছে ছুটে আসে;—তার মত ব্যক্তির মনেও আজ আর কোন সুখ নেই! এ যেন নিয়তির একটা প্রচ্ছন্ন পরিহাস!

দোতলার প্রকাণ্ড হল ঘরটায় বসে সরোজ রায় তাঁর স্ত্রী লতিকার সঙ্গে কথোপকথনে মত্ত ছিলেন,—এমনি সময়ে কৌচের পাশের টিপয়ের উপর থেকে হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠলো; লতিকা রিসিভারটা তুলে ধরেই বললেন—"হ্যালো—কাকে চান?"

ওধার থেকে উত্তর এলো,—"সরোজ বাড়ী আছে।" সে কথার উত্তর না দিয়ে টেলিফোনের রিসিভারটা স্বামীর হাতে

তুলে দিয়ে লতিকা বললেন,—"তোমায় রেবতী বাবু ডাকছেন !" স্ত্রীর কথায় তাড়াতাড়ি রিসিভারটা কাণের পাশে নিয়েই সরোজ বললেন,—"কে রেবতী ?—কে'ন ডাকছো ভাই ?"

রেবতী বাবু ওপাশ থেকে উত্তর দিলেন,—"তোমার সঙ্গে একটু আলাপ করবার জন্য অমনিতেই ডাকছিলুম !" তারপর বললেন,—"তা কেমন আছ তোমরা ? ডেকে ডেকে তো টেলিফোনে তোমাদের আজকাল পাওয়াই যায় না ?"

"—তার মানে ? না ডেকেই বোলছো পাওয়া যায় না ?"

—"ডাকলেই কোনদিন শুনি এন্‌গেজড্ কখনো বা শুনি নো-রিপ্লাই ! আজকাল কর্ত্তা গিন্নী দুজনেই বুঝি বাড়ী থাকোনা ?"

—"উচ্চহাস্য করে সরোজবাবু বললেন—"কোন্ চুলোয় আর যাবো বলো ? বাড়ীর বাইরে যে একটা জগৎ রয়েছে আমরা তার খোঁজ রাখিনা বহুকাল ! সেক্ষেত্রে নো রিপ্লাই তো হবার কোন চাঞ্চ্ নেই। টেলিফোনের পাশেই তো বসে রয়েছি সর্ব্বক্ষণ !"

"তা হয়তো থাকো, কিন্তু আমি আরো দুদিন ডেকেছি তোমাদের কাউকেই পাইনি—তাই অভিযোগ করছি। সে কথা যাক ! এখন বলছি কি শোন।"

—"বল ভাই প্রাণ খুলে ব'ল ; শুনছি।"

—"তেমন নতুন কথা কিছু নয়। তবে তোমার পক্ষে হয়তো একটা সুখবরও হতে পারে !"

—"আমার পক্ষে সু-খবর ? হাসালে রেবতী ! ত্রিকূলে

যার সব থেকেও কেউ নেই ; নিজের সন্তান যার পর হয়ে যায়, তার পক্ষে কি আরও কোন সুখবর এ দুনিয়ায় থাকতে পারে ?"

—"আছে আছে সত্যিই সুখবর ! তোমার ছেলে ক্ষীরোর মেণ্ট্যাল হাসপাতালটা যে প্রায় দাঁড়িয়ে উঠলো হে ? পারি তো একবার যাবো আজ বিকেলে তোমার ওখানে—বোল্‌বো'খন সব গিয়ে।"

—"আচ্ছা এসো ! রিসিভার রেখে দিচ্ছি তা হলে ?" রিসিভারটা টেলিফোন বক্সের গায়ে নামিয়ে রেখেই সরোজবাবু লতিকা দেবীকে বল্‌লেন,—"রেবতী আমাকে আজ সুখবর দিয়ে রাজা করে দেবে বুঝেছ ? ক্ষীরোর মেণ্ট্যাল হাসপাতাল নাকি দাঁড়িয়ে গিয়েছে।"

দৈনিক কাগজের পৃষ্ঠা থেকে মুখ তুলে স্বামীর দিকে চেয়ে লতিকা বললেন,—"টাকাকড়ির কিছু দরকার পড়েছে বলেই তোমার ছেলের নাম দিয়ে সুখবর একটা কিছু না জানালে চল্‌বে কে'ন ? অগত্যা ধৈর্য্য ধরে বিকেল পর্যন্ত থাকো ! তবে রেবতীবাবু আজ কিছু না আদায় করে যে ছাড়ছেন না—এটুকু বেশ বোঝা যাচ্ছে।" বলেই লতিকা আবার সংবাদ পত্রের দিকে মনোনিবেশ করলেন। ইতিমধ্যে বেয়ারা এসে ট্রে ভর্ত্তি চায়ের সরঞ্জাম সমেত জল গরম রেখে, রেডিওটা খুলে দিয়ে গিয়েছিল। কালোয়াতি সুরে একটা হিন্দী গান সেখানে বাজতে সুরু কোরলো ! রেডিওর গানে সরোজবাবুর চিন্তাজাল

সহসা ছিন্নভিন্ন হয়ে গে'ল। লতিকা এক কাপ্ চা আর কিছুটা হালুয়া সরোজবাবুর পাশে একটা টিপয়েতে রেখে খেতে বললেন।

রেডিওর হিন্দী গানটী তখন ভালোভাবে রীতিমত জমে উঠেছে। সহসা লতিকা বলে উঠলেন—"ওগো থামিয়ে দাও, আর ভাল লাগে না।"

রেডিওটা সহসা বন্ধ ক'রে উদাস বিষণ্ণভাবে দূরের দিকে চেয়ে, সে কথার উত্তরে সরোজবাবু বললেন,—"ভালো তো লাগবার কথা নয় লতু, কিছুই আর ভাল লাগে না।" তখন লতিকা বললেন—"ক্ষীরো যে শেষকালটায় আমাদের সঙ্গে এমনি বেইমানি করবে, এতটা আমি ধারণাও করিনি কোনদিন!" তারপর চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে তিনি বলে উঠলেন—"দুটো মাত্র ছেলেমেয়ে যে এত অবাধ্য হ'তে পারে। একথা ভাবতেও আমার মাথা ঘুরে ওঠে!"

একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস মোচন করে ব্যারিস্টার বললেন—"মাথা আমাদের হয়তো নেই লতু, সেইজন্যই মাথাটা আমাদের ঘোরে! এ যুগে শিক্ষার ক্রমোন্নতির কথাই দেশে দেশে শোনা যায়; কিন্তু এ পোড়া দেশের ছেলে মেয়েগুলো যত শিক্ষা দিক্ষা পাচ্ছে তত যেন অবনতির অতল তলে ডুবে যাচ্ছে। আজ উচ্চ শিক্ষার নামে দেশের শিক্ষিত ছেলে মেয়েরা বিজাতীয় কুৎসিত অনুকরণের সেবা করে চলেছে।" তারপর খানিকক্ষণ থেমে সরোজ বাবু আবার সুরু করলেন—

"মানসিক চিকিৎসা বিদ্যায় প্রথম স্থান অধিকার করাবার জন্য ক্ষীরোকে আমি প্রথমে জার্ম্মানীতে, এবং শেষে ইয়োরোপের প্রত্যেকটী বড় প্রতিষ্ঠানে ঘুরিয়ে এনেছি। সেই ক্ষীরো আমার দেশে ফিরে এলো ডাক্তারীর উঁচু ডিগ্রী নিয়ে।" তারপর অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে ব্যারিস্টার বলে উঠ্‌লেন,—"ওর বয়স আর কোয়ালিফিকেশন্ দেখে স্বয়ং ভারতগভর্ণমেণ্ট ওকে চাকরিতে বহাল করতে চাইল,—ও গ্রাহ্যই কোরলো না সে চাকরি! শেষে দেখলে তো হতভাগার তেজ? আমি ওকে স্পেশাল চেম্বার খুলে দিতে চাইলাম। নাঃ তাতেও ওর চললো না! নিজেই উনি হাঁসপাতাল খুলে এদেশে যত গরীব দুঃখী আছে তাদের বিনি পয়সায় চিকিৎসা করে উদ্ধার করে দেবেন! এতবড় ইডিয়ট ত্রিভূবনে আর জন্মেছে বলে শুনেছো?"

লতিকাদেবী কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, —"ওদের মাথায় যে একটা বদ্ধমূল ধারণা ঢুকে বসে আছে কি না? ক্ষীরোর কথাই ব'ল, আর মাধবীর কথাই ব'ল, বাপ, মা সম্বন্ধে ওদের ধারণাই হোল যে, আমরা দু'জনেই কৃপণ! বাপ যে ওদের কত কোটী টাকার মালিক তা ওরাই জানে। ধনী বাপের ছেলে হয়ে ওরা পয়সা রোজগার করবে কি ক'রে বুঝছো না?" "হোঃ—হোঃ" করে হেসে উঠে সরোজবাবু বললেন,—"তাই বটে লতু, সত্যিই তাই!" তারপর তিনি একটা দীর্ঘ নিশ্বাস মোচন ক'রে বললেন,—"হতভাগাটা বিলেতে গিয়ে একেবারে বানর হয়ে এসেছে! বসে খেলে

রাজার গোলাও যে শূন্য হয়ে যায়! কটাই বা টাকার বড়লোক তোদের বাপ? বিপদ আছে, আপদ আছে, অসুখ আছে, বিশুখ রয়েছে! সামান্য যে কয়টা টাকা না খেয়ে, না বিলিয়ে দিয়ে, জমিয়েছি,—তা কি আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাবো? তোরাই তো তা ভোগ দখল করবি। এটুকু বোঝবার বুদ্ধিও কি ওদের হয় নি লতু?"

—"সেই বুদ্ধিই যদি থাকবে? তো বিলেত থেকে কলকাতায় পৌঁছেই ও কি ক'রে হাসপাতাল খুলবার জন্য বাপের কাছে টাকা চেয়ে বসতে পারে?"

সরোজবাবু লতিকার কথার উত্তর দিতে গিয়ে সুরু করলেন,—"মাধুকে তুমি নিজে হাতে গড়ে তুলেছো তো? মা বোলতে যে মেয়ে একদিন অজ্ঞান হোতো—তোমার এতটুকু অভাব অসুবিধের কথা কানে গেলে যে বাড়ীর ঝি চাকরগুলোকে গালমন্দ করতো? অমন ঠাণ্ডা প্রকৃতির সেই মেয়ে কি না—তোমারি মুখের ওপর বলে বোসলো বিলাস ছাড়া ও আর কারু সঙ্গে বিয়ে বসবে না! নিজে থেকে উপযাচক হয়ে, ও গিয়ে জুঠ্‌লো বিলাসের সঙ্গে! কি ছিল ছোকরার? না টাকা; না বিষয় সম্পত্তি! কোথাকার একটা হা ঘরের ছেলে প্রাইভেট টিউটার, সেই হয়ে উঠলো……—তোমার অমন পছন্দ করা রূপচাঁদ বাবুর বিলেত ফেরৎ আই-সি-এস ছেলের……?" বলেই তিনি লতিকার মুখের দিকে চেয়ে সহসা থেমে পড়লেন।

লতিকা দেবী কাপড়ের আঁচল দিয়ে ভাল করে চোখ হু'টো রগড়ে নিয়ে বললেন,—"আমাদের অদেষ্টই খারাপ! নইলে আর কার এমন হয়? হু'টো ছেলে মেয়ের জন্য আমরা যা করেছি এ যুগে তার তুলনা হয় না! কিন্তু অভাগা অভাগীরা তা বুঝলে না!" তারপর চোখের জল মুছতে মুছতে তিনি বললেন—"বুঝতে একদিন হবেই ওদের! তবে ততদিনে আমরা হয়তো..."

বিশুষ্ক মুখে—দূরের দিকে চেয়ে সরোজ বাবু বললেন,—"মরেও আমাদের শান্তি নেই লতিকা! মরেও আমরা শান্তি পাবো না!" মেঝের দিকে চেয়ে সরোজ বাবু অনেকক্ষণ ভাবলেন,—তারপর বললেন,—"মাঝে মাঝে মনে হয়—চাটী, বাটী, খুদ কূড়ো যা আছে কোনও একটা অনাথ আশ্রমকে বিলিয়ে দিয়ে, হু'জনে মিলে তীর্থে তীর্থে ঘুরে জীবনটা কাটীয়ে দি! কিন্তু তাতেও মন তো ঠিক সাড়া দিচ্ছে না লতু? কিসের যেন একটা ক্ষীণ আশা—যেন কিসের একটা আকাঙ্ক্ষা, কোথায় যেন আমাকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে!" তারপর একটী নিশ্বাস মোচন করে সরোজ বাবু বললেন,—"বোলতে পারো লতু? কেন মানুষ সন্তানের জন্য এমন কাঙ্গাল হয়? কিসের এই অন্ধ আকাঙ্ক্ষা মানুষকে উল্কার মতো ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়? আজ আমার কেবলি মনে হচ্ছে কি জানো? সারা জীবন শুধু আমরা একটা ভুলের বোঝা বয়ে বেড়িয়েছি! আর হয়তো সেই উদ্দেশ্যহীন ভুলেরি প্রায়শ্চিত্ত করে মরছি জীবনের

এই শেষ বেলায়! কেনই বা জগতে এসেছিলাম আর কোথায় যে যেতে হবে এ কথাটা আমরা কোনদিনই ভাবিনি লতু! অথচ আজ দিন যত কাটছে, তত কেবলি এই ভাবনাটা আমাকে যেন উত্যাক্ত করে মারছে! এর পরিণতি কোথায় জানো?"

অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে দূরের দিকে চেয়ে লতিকা উত্তর দেয়,—

—"পরিণতি! হয়তো উভয়েই একদিন পাগল হয়ে যাবো, নয়তো লোকালয় ছেড়ে কোনও জায়গায় দুজনারি একদিন পালিয়ে যেতে হবে। এ ভাবে তো মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না।" এমনি সময়ে সরোজ বাবু রেডিওর সুইসটা ঘুরিয়ে ক্যালকাটা ষ্টেশন ধরলেন। রেডিওতে তখন গানের রেকর্ড বাজছিল—

"পাগলা মনটারে তুই বাঁধ।
কেনরে তুই যেথা সেথা পরিস প্রাণে ফাঁদ..."

দশ

আশার নেশায় দিনকতক নানা জায়গায় কাজকর্ম্মের জন্য হাঁটাহাঁটি ছুটোছুটী করে হঠাৎ একদিন বিলাস জ্বরে পোড়লো। এবং বিলাসের সেই জ্বর একদিন বিকারে পরিণত হ'ল। এদিকে মুস্কিলে পড়েছে সব চাইতে বেশী মিনা তার মাধবী বৌদিকে নিয়ে! উদাসিনীর মতো কবে থেকে সেই-কি যে এক রকমভাবে দিন কাটাচ্ছে মাধবী,—তা সে কিছুতেই বুঝতে পারে না! সময় ম'ত স্নানাহার ভুলেছে সে আজ বহুদিন ধরে, দস্তুর ম'ত ঝগড়া করে তবে মিনাকে আজ মাধবীর মুখে অন্ন তুলে দিতে হয়! অত্যন্ত রেগে গিয়ে মিনা এক একদিন বলে,—রোগ যেন আর কারো হয় না পৃথিবীতে! জ্বরের ঘোরে আবোল তাবোল সে অনেকেই ব'কে থাকে, তাতে হয়েছে কি? তেমন বেশী কিছু হ'লে দাদাকে বলে বিলাসদাকে সরোজ সেবা সদনে ভর্ত্তি করিয়ে দিয়ে সারিয়ে তুলবে সে। এমনি এক একটা সান্ত্বনার কথা বলে বলে মিনা মাধবীর মনের দুশ্চিন্তাগুলো ঝেঁটিয়ে তাড়াবার চেষ্টা করে। তারপর কোনদিন নিজের ঘরে টেনে নিয়ে গিয়ে হারমনিয়মের ডালাটা খুলে দিয়ে বলে,—বিলাস দা'র মাথার পাশের টেবিলে বসে অরুণ ড্রইং শিখছে। বিলাস দা এখন বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুচ্ছে। এইবার আপনি বসুন দিকি এইখানে স্থির হয়ে। তারপর হারমনিয়মের ষ্টপ গুলো খুলে দেয়।

সেদিন বিলাসের রোগের বাড়াবাড়িটা যেন অনেক কম ছিল। অরুণ ও পাশের ঘরে শুয়ে ঘুমুচ্ছিল। বাড়ীতে প্রায় কেউই ছিল না। বেলা তখন গোটা চারেকের মতো হবে। মিনা এসে মাধবীকে টেনে নিয়ে গেল ওপাশের ঘরে, হারমনিয়মে তার গান শোনবার জন্য।

স্নেহ-মুগ্ধ মাধবী দেবী কিছুতেই—কে'ন যে'ন এড়াতে পারে না এই মিনাকে। হারমনিয়মে হাত দিয়ে সে বাজাতে সুরু করলো। মিনা বলে ও-সব রীড্ টেপাটিপিতে ভুলবো না! দস্তুর মত গান গাইতে হবে! বলেই সে হাসে। মাধবী উদাস দৃষ্টিতে দূরের দিকে চেয়ে গাইতে সুরু করে—

গান।

আমার এই দুঃখ নিশি
কভু কি পোহাবে নাকি?
কতকাল শুধু আমি
নীরবে রহিব জাগি!
ফোটে না দিনেরি আলো,—
এ যে নাহি লাগে ভালো;—
অচপল নিশীথিনী—
রেখেছে নয়ন ঢাকি!
আমার কুটীর পাশে, হেনা করে কানাকানি,
বনের পাপিয়া কাঁদে—ল'য়ে বেদনার বাণী,
বুকে লাগে ঢেউ তারি—
যত মুছি আঁখি বারি;
আলেয়ারে চাহি মিছে
ভাবি আর নাহি বাকী!

গানটি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিলাস সহসা ডেকে উঠলো, —"অরুণ—" কিন্তু অরুণের পরিবর্ত্তে সে কথার উত্তর দিলো ও ঘর থেকে ছুটে এসে মাধবী, এবং এগিয়ে গিয়ে সে বললো— "অরুণ ওপাশের ঘরে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। খাবে এখন কিছু?"

সে কথার কো'ন উত্তর না দিয়ে বিলাস মাধবীর হাতখানি তার নিজের বুকের কাছে টেনে নিতে নিতে বললো, —"তোমাকেই খুঁজছিলুম মাধু—তোমাকেই শুধু! গান গাচ্ছিলে তুমি? কি ছাই গান তোমার! এই দে'খ, তোমার গান শুনে আমার বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্ করছে!"

"গান শুনলে বুঝি বুকে বড্ড লাগে তোমার? তবে আর আমি কোনদিন গান গাইব না!"

"তোমার গান আমার বুকে লাগবে! বোলছো কি তুমি? দুঃখের গান কেন গাও মাধু? প্রেমের গান গাইতে পার না? তুমি গাও দেখি—

"কেবলি আঁখি দিয়ে
আঁখির সুধা পিয়ে,
হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব,
আঁধা'রে মিশে যাক আর সব,—"

"—ওটা তো রবীন্দ্রনাথের 'এমন দিনে তারে বলা যায়,' একটা কবিতার অংশ বিশেষ।"

—"হোলই বা কবিতা! ওটাও একটা গান। আর রবীন্দ্রনাথের কোন্ কবিতাটাই বা প্রেমহীন ব'ল? তাজমহলের পাথরের ভেতরে তো রয়েছে শুধু ঐশ্বর্যের গর্ব্ব! ওটা তৈরী

হয়েছিল অপ্রেমিকের হৃদয়ে প্রেমের কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য! আর দেখ দেখি আমাদের কবির অনুভূতি! তিনি তাজমহল নিয়ে এমন কবিতা লিখলেন, যা প'ড়ে মানুষ মমতাজের চাইতে সাজাহানকেই অন্তরে উপলব্ধি করলো বেশী! কিন্তু সে যাক্! তুমি প্রেমের গান আমায় পারবে না শোনাতে আজ?"

—"কে'ন পারবো না গো?—আগে উঠে বসো, আমি খাবার নিয়ে আসি! খাওয়া শেষ হলেই আমি নিশ্চয় তোমাকে গান শোনাব!"

প্রচণ্ড ভাবে মাথা দুলিয়ে বিলাস বলে উঠলো,—"না—না —না—মাধবী, খাবার নয়, খেতে চাইনা আমি, তোমার তাগিদে উদর আমার এতটুকুও উপবাসী হয়ে নেই! উপবাসী আমার মন! আমার সকল চিত্ত আজ বড় একা—বড় কাঙ্গাল মাধবী!—আমি শুধু আজ তোমাকেই চাই!" তারপর সহসা মাধবীর গলাটি এক হাতে জড়িয়ে ধরে বিলাস কানে কানে বললো,—"যে কথা এ জীবনে রহিয়া গেল মনে,—সে কথা আজি যেন বলা যায়,—"

তারপর বিলাস চেঁচিয়ে বলে উঠ্‌লো,—"সত্যি বলা যায় মাধু—সব বলা যায়! কবির ভাষাতেই আজ তাই বলতে সাধ হয় মাধবী,—

"জীবনের যত পূজা হলো না সারা
জানি হে জানি তাও হয় নি হারা,
যে ফুল না ফুটিতে টুটিল ধরণীতে—
যে নদ' মরু পথে হারালো ধারা,
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।"

স্বামীর এই সমস্ত কথায় মাধবীর চক্ষে জল ভরে ওঠে। কেবলি তার মনে হয়—সংসারের অভাব অনটনের কথা চিন্তা করে করেই বিলাস আজ এমনি রোগ শয্যায় ভেঙ্গে পড়েছে! অথচ মাধবী তো অশিক্ষিত' নয়! কে'ন তার পিতা মাতা তাকে উচ্চ শিক্ষা দিয়েছিল—? যদি দুর্দ্দিনেই সে তার স্বামীর কোনো কাজে না লাগতে পারলো—তো কি প্রয়োজন ছিল তার এই শিক্ষার? বিলাস যদি বুঝতো, মাধবী অসময়ে সংসার চালিয়ে নেবার সামর্থ রাখে;—পড়তো কি বিলাস তা'হলে এমনি রোগ শয্যায় এলিয়ে? না-না—যে কোন মূল্য দিয়েই হোক মাধবী বিলাসকে সুস্থ করে তুলবে; নিজে রোজগার করে সে বিলাসকে মেণ্টাল হাসপাতালে পাঠাবে! বিলাসকে না হলে মাধবীর এক দিনও চলবে না! যার জন্য সে তার ধনশালী পিতার বিপুল ঐশ্বর্য সম্পদ পর্য্যন্ত উপেক্ষা করে আসতে পেরেছে। তাকে বাঁচিয়ে তুলতে, তাকে সুখী করতে মাধবী নিজের জীবন বিপন্ন করতেও রাজী। মাধবী আর চায় না যে বিলাস এমনি রোগ শয্যায় ছট্‌ফট্‌ করুক! এই সব নানা কথা ভাবতে ভাবতে মাধবী বিলাসের রুক্ষ, শুষ্ক, চুল গুলোতে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। তারপর সে বললো—
"এইবার খাবার নিয়ে আসি?"

স্ত্রীর কথায় বিলাস সহসা বিছানায় উঠে বসে, মাথা নেড়ে বললো—"তোমাকে এখন আমি কিছুতেই ছাড়তে পারি না মাধবী!" তারপর সে সুর করে বলতে লাগলো,—

"—তুমি আমাকে আজ এমন একটা গান শোনাও মাধবী, যে গানে অন্তর ভরে ওঠে, রোগ যন্ত্রণার উপশম হয়! আমি আবার ঘুমিয়ে পড়ি।" বলেই বিলাস তার উপাধানে, কনুইয়ের উপর মাথা রেখে মাধবী দেবীর মুখের দিকে চেয়ে রইল। নাছোড়বান্দা স্বামীকে খুশী করতে ব'সে মাধবী তখন সুরু করলো,—

গান

তুমি নিশীথের আঁধিয়ারে
মোর দীপালী,
তারার প্রদীপ পথে
রেখেছ জ্বালি।
দূরের নদীর পারে—
খেয়া পাতি বারে বারে,
পার কর তুমি মোরে
একি হেঁয়ালি!
তুমি মোর নিরাশায়
আশার আলো,
গোপন হৃদয়ে প্রেম
প্রদীপ জ্বালো ;
আমার চলার সাথে
হাত দুটি দিয়ে হাতে
লয়ে চলো আরো দূরে
ওগো খেয়ালী!

গানখানি শেষ হয়ে গেলে মাধবী চেয়ে দেখলো, স্বামী তার কখন যেন গান শুনতে শুনতে অঘোর ঘুমে অচৈতন্য হয়ে পড়েছে। তখন, ঘরে ডে-লাইট বাল্‌ব জ্বেলে দিয়ে, সে দরজাটা ভেজিয়ে, ওপরে মিনার ঘরের দিকে আস্তে আস্তে অগ্রসর হ'ল। অরুণ ততক্ষণে এ ঘরে ঢুকে বাপের মাথার পাশের টেবিলে পড়বার জন্য বই নিয়ে বসেছে।

এগারো

বাপের বাড়ীর মায়া কাটিয়ে নিজের বাড়ীতে এসে মিনতী এবার যেন একেবারেই বদলে গেছে। আর তাই দেখে সব চাইতে বেশী আশ্চর্য হলেন ধীরেনবাবু। এটা তবুও মন্দের ভালো, এইটুকু ভেবেই তিনি নিশ্চিন্ত হলেন। স্বামীর সঙ্গে আলাপ আলোচনার পরিবর্ত্তে আজকাল মিনার সঙ্গেই কথা বলতে মিনতী ভালবাসে বেশী।

মিনা প্রথমতঃ একটু বিস্মিত হয়েছিল। কিন্তু আজকাল মিনতীকে সে কোন ভাবেই আর এড়াতে পারে না। এক একবার তবুও মিনা তার বৌদিকে নানা রকমের কথা বলে ঠাট্টা

তামাসা করবার চেষ্টা কম করে না। কিন্তু মিনতীর সঙ্গে সত্যিই সে আর পারে না। রাগাবার চেষ্টা করলে, যে মানুষ হেসে উড়িয়ে দেয়। অর্থের প্রলোভন এবং ঐশ্বর্যের গর্ব্ব যার কাছে সহসা তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের বস্তু হয়ে উঠেছে, তাকে আর মানুষ উপহাস করবে কি নিয়ে! মিনা মাঝে মাঝে আজকাল তাই অবাক হয়ে তার বৌদির মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

হাসপাতালে যাবার জন্য ভোরবেলা সেদিন মিনা সেজে গুজে বেরুতে যাবে, এমনি সময়ে মিনতী তাকে বলে বোসলো—"কৈ ভাই ঠাকুরঝি তোমার হাসপাতালে তো আমাকে একদিনও নিয়ে গেলে না? যাবে আজ আমাকে সঙ্গে নিয়ে?"

অপরিসীম বিস্ময়ে মিনা হেসে বলে—"হঠাৎ হাসপাতালে যাবার সখ হোল কেন' বৌদি ?"

তাচ্ছিল্যের সুরে মিনতী বলে,—অম্‌নি! শুধু শুধু দিন-রাত বাসায় বসে কি আর ভাল লাগে?"

—"তা কোথাও বেড়াতেও তো যেতে পারো দাদাকে নিয়ে। হাসপাতালে গিয়ে দেখবে তো শুধু নানা রকমের রোগী! তার কোন'টা পাগল, কোন'টা আধ পাগল! আর কোন'টা একেবারে বদ্ধ পাগল।"

—"ঐ পাগল গুলোকেই তো আমার দেখতে সাধ হয়! চলই না আজ আমাকে নিয়ে।"

—"আচ্চা পাগল তো তুমি! আমি যাচ্ছি সেখানে আমার ক্লাস করতে। সময়ও আজ আর বেশী নেই! সেখানে তোমাকে

নিয়ে যাবো কি করে ? আমি থাকবো লেক্‌চারের ঘরে !—তুমি তখন থাকবে কোথায় শুনি ?"

—"আমি না হয় তোমার পাশেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ডাক্তারের লেক্‌চার শুনবো !"

—"সে হয় না ! ডাক্তার পাল রীতিমত বুড়ো মানুষ, তা ছাড়া তিনি আজ মস্তিষ্ক সংক্রান্ত ব্যাপারে তথ্য পূর্ণ লেক্‌চার দেবেন।" বলে মিনা তার বাঁ হাতের ঘড়িটাতে নজর দিয়েই বলে উঠলো,—"আর দাঁড়াবার সময় নেই বৌদি ! আমি চললুম, অন্য একদিন তোমায় নিয়ে যাবো"—বলতে বলতে মিনা সিঁড়ি দিয়ে গট্‌ গট্‌ করে নেমে গে'ল।

মিনা চলে যেতেই মিনতী গিয়ে মিনার পড়ার টেবিলের পাশে একটা বই তুলে পাতা ওল্টাতে লাগলো। পাশের ঘরের টেবিলে অন্যমনস্কের ম'ত ছ'পা তুলে দিয়ে, দূরের দিকে দৃষ্টি হারিয়ে কি যেন ভাবছিলেন ধীরেনবাবু ! পাশের কক্ষে নজর পড়তেই, খোলা জানালার পথে চেয়ে দেখলেন মিনতী ! সহসা মিনার পড়বার ঘরে, মিনতীকে দেখে তিনি যেন নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করতে পারলেন-না। চেয়ার ছেড়ে উঠে তখন আস্তে আস্তে পাশের দরজা দিয়ে তিনি মিনার ঘরে ঢুকেই নিরাভরণা মিনতীর দিকে আগাগোড়া লক্ষ করে বেয়াকুবের মত চেয়ে রইলেন।

পেছন ফিরে, সেই অবস্থায় ধীরেনবাবুকে দেখেই মিনতী বললো—"অমন করে চেয়ে রয়েছ কেন ? কি হোল তোমার ?"

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস মোচন করে ধীরেন বাবু বললেন—“কি যে হয়েছে তাতো তুমিই আমার চাইতে বেশী জানো!” তারপর একটু হেসে বললেন—“গয়নাগুলো কি বাক্সে রেখেছ? না কোথাও বেচে দিয়েছ?”

একটুখানি হেসেই মিনতী বললো—“বিলিয়ে দিয়েছি।”

—“বিলিয়ে দিয়েছ? সোনার গয়না? বলছো কি তুমি?”

বইয়ের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে মিনতী উত্তর দেয়—“আমার বাবার একজন গরীব বন্ধুর মেয়ের বিয়ের জন্য দান করেছি।” তারপর উপেক্ষার হাসি হেসে সে বলে—“কি হবে গয়না দিয়ে? বাক্সে তো আরো অনেক রয়েছে। বেচতে চাও নিয়ে বেচে দাও। ও আর আমি পরবো না!”

স্তম্ভিত বিস্ময়ে স্ত্রীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে, ধীরেন বাবু বললেন—“তোমার কথা শুনে হাসবো কি কাঁদবো ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না!” তারপর একটু ভীত চিন্তিত সহানুভূতির স্বরে তিনি মিনতীকে প্রশ্ন করলেন—“গয়না বিলিয়ে দেবার এই ব্যাপারটা কি তোমার প্রচ্ছন্ন বিলাস,—না বৈরাগ্যের লক্ষণ?” সে কথার কোনও উত্তর না দিয়ে মিনতী দেবী মিনার কক্ষ থেকে অতি অকসাৎ বেরিয়ে চলে গে'ল। বিস্ময়ে বিমুগ্ধ ধীরেন বাবু তখনও মিনার ঘরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিনতীর এই মানসিক ভাবান্তরের ব্যাপারটা মনে মনে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

বারো

হাসপাতালের বিরাট একটি কক্ষে ক্লাস বসেছে। মাঝখানে লম্বালম্বি ভাবে বিরাট একটা টেবিলের ওপর ডেড্‌ব'ডির কতগুলো মডেল এবং মাথার খুলি, পর পর শ্রেণী বদ্ধভাবে সাজানো রয়েছে! টেবিলটার ছ'পাশেই সারিবদ্ধ ভাবে, ডাক্তার পালের লেক্‌চার শোনবার আশায়—কলেজের ছাত্র ছাত্রীরা দণ্ডায় মান। টেবিলের এক পাশের সারিতে ডাক্তার ঘোষ, ডাক্তার মৈত্র, ডাক্তার রায়, ডাক্তার ব্যানার্জ্জি প্রভৃতির সঙ্গে আরও চার জন নবাগত ছাত্র অপেক্ষা করছিল। টেবিলের অপর দিকের সারিতে জন তিনেক ছাত্রীর সঙ্গে লেক্‌চার শোনবার জন্য ডাক্তার পালের দিকে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিল—সুচিত্রা, শেফালি আর মিনা।

খান কয়েক মোটা বইয়ের পাতা উল্টে পাল্টে ডাক্তার পাল উঠে দাঁড়িয়ে সমবেত ছাত্র ছাত্রীদের উদ্দেশ করে বললেন। "আমার প্রিয় ছাত্র ছাত্রীগণ যদিও বডি ডিসেক্‌স্‌ন সম্পর্কেই আজ আমার বিশেষ লেক্‌চার দেবার কথা ছিল কিন্তু সেটাকে আমি আজ প্রয়োজন বোধেই বাদ দিয়ে তোমাদের কতগুলো নতুন কথা শোনাতে চাই। সরোজ সেবা সদনে জনসাধারণের মানসিক চিকিৎসাই বেশী হয়ে থাকে, কিন্তু এই চিকিৎসা যে ক'ত দুরূহ এবং কত দায়িত্বপূর্ণ তা জানতে হলে, প্রথমেই তোমাদের মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তোমরা নিশ্চয়ই শুনে থাকবে ইতিপূর্ব্বে লণ্ডনের একজন

সুবিখ্যাত ডাক্তার—মানুষের মস্তিষ্ক থেকে রশ্মি সমূহ বিকিরণের এক অপূর্ব্ব তথ্য আবিষ্কার করেছেন। তিনি প্রথমেই বলেছেন; মস্তিষ্ক বিকিরণের পরিমাপ নিতে গিয়ে, আমরা দেখেছি মানুষের মন; মনস্তত্ত্বের পরীক্ষার চাইতেও সঠিক এবং পরিস্কার ভাবে, মানুষের মনের আলো অথবা অন্ধকার, দুর্ব্বলতা এবং শক্তি, ভয় অথবা সাহস,—সঙ্কীর্ণতা কিম্বা উদারতা এতে খুব সহজে আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে ধরে দিতে পারে। যা থেকে মানুষের জীবনের অজানা রহস্য,—যেমন তার ইচ্ছা, অনিচ্ছা, তার ধীশক্তি তার মানসিক শক্তি সমস্তই তার মস্তিষ্কের বিকিরণের পরিমাপ থেকেই সচ্ছন্দে আবিষ্কার করে ফেলা যেতে পারি।

কমবেশী কতকগুলি মানসিক শক্তি নিয়ে প্রত্যেক মানুষই এই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু যদি পৃথিবীর সমস্ত মানুষই খুব মানসিক শক্তি সম্পন্ন হতো, তা হলে কিন্তু অনেক প্রয়োজনীয় কাজের জন্যও আমরা সুনিপণ বা অনিপুণ শ্রমিক পেতাম না। আমাদের বালক বালিকাদের শিক্ষা ব্যবস্থার ভিতরে এটা খুবই লক্ষ রাখা উচিৎ যাতে, তারা তাদের জন্মগত যোগ্যতাকে সুগঠিত করে তুলতে পারে। কিন্তু যদি আমরা তাদের যোগ্যতার অনেক উর্দ্ধে, বা অনেক নিম্নে, জোর করে তাদের পরিচালিত করবার চেষ্টা করি, তা হলে কিন্তু তারা বিভ্রান্ত হতে বাধ্য। একজন স্ত্রী বা পুরুষের মানসিক ক্ষমতা সমান। কিন্তু বালক বালিকাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং

তাদের প্রতি সাধারণের মনোভাব, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাদের মানসিক শক্তিকে ঘুম পাড়িয়ে রাখে। কখনো বা তাদেরকে আবেগ জনিত সমস্যার সম্মুখীন করে দেয়; এবং তারি ফলে বালক বালিকাদের মানসিক ক্ষমতা বিভ্রান্ত হয়। এই বিভ্রান্তির পরিণাম প্রায় ক্ষেত্রেই মারাত্মক হয়ে ওঠে। একমাত্র Proper Treatment ছাড়া, মস্তিষ্কের রশ্মি বিকিরণের বায়োমেট্রিক পাওয়ারের তারতম্য অনুসারে রোগীর মানসিক যোগ্যতার দিকে লক্ষ রেখে,—প্রাকৃতিক চিকিৎসার ভেতর দিয়ে যদি বা রোগীকে সারিয়ে তোলা সম্ভব, কিন্তু তাই বলে ইনজেকশনের দ্বারা তার অযোগ্য মস্তিষ্ক গ্রন্থির উন্নতি সাধন করা কোনদিক থেকেই সম্ভব নয়। তা যদি হোত, তা হলে ইনজেকশনের দ্বারা শুধু যে মানুষের মস্তিষ্কেরই উন্নতি সাধন করা সম্ভব হোত তাই নয়, একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তিকেও প্রতিভাবান করে তোলা, সেই ইনজেকশনের সাহায্যেই সম্ভব হোতো।

ডাক্তার বলেছেন; মস্তিষ্কের বিকিরণের ভিত্তিতে পরীক্ষা করতে গিয়ে, আমরা দেখি ইউরোপের শতকরা ৮০ জন মানুষের মস্তিষ্কে, ২২৫ থেকে ২৩০ বায়োমেট্রিক রশ্মি বিকিরিত হয়। এবং সেটা হচ্ছে দৃশ্যমান আলট্রাভায়লেট—রশ্মির তরঙ্গায়তি। এই পর্য্যায়ে ফেলা চলে সাধারণ কর্ম্মী, ডাকপিয়ন, তন্তুবায়, যন্ত্রশিল্পী, ছোট দোকানদার, কেরানি, এবং টাইপিষ্ট প্রভৃতিকে। কিন্তু যখন এই বায়োমেট্রিক রশ্মি, মানুষের ২৪০ বায়োমেট্রিকে দেখা দেয়, তখনই তার জ্ঞান ও ভাবের সদ্গুণাবলী কার্য্যে

রূপান্তরিত হ'তে সুরু করে। এই বায়োমেট্রিক রশ্মি যখন ২৪০ থেকে ৩০০ ডিগ্রীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তখন আমাদের প্রধান শক্তি ও উৎসাহ, স্থূল জগতের কার্য্যকারীতাতে সীমাবদ্ধ থাকে। সহস্রাধিক ব্যক্তির মস্তিষ্কের রশ্মি গবেষণা থেকে এটা বিশেষ ভাবে প্রমাণিত হয়েছে—যে, মস্তিষ্ক বিকিরণের পরিমাপ ৩০০র কম হ'লে, কোনো ছেলেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করা উচিৎ নয়; কারণ সেখানে তারা অনুপযুক্ত প্রতিপন্ন হবে। অধিক বিকিরণ শক্তি সম্পন্ন, বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের মানসিক শক্তির সঙ্গে, প্রতিযোগিতা মূলক সংগ্রামে, যখন এই সব, কম বিকিরণ শক্ত সম্পন্ন ছেলেরা আর পেরে ওঠে না, তখনই তারা অধঃপতনের ধাপে নেমে আসে। ফলে আমরা দেখতে পাই, ছেলেকে অত্যধিক ভালো তৈরী করতে গিয়ে তারা এক একটা শয়তান ও বদমাইস হয়ে উঠেছে। অথচ এটা যে তাদের সীমাবদ্ধ শক্তির প্রভাবেই সংঘটিত হয়ে থাকে, সেটা আমরা তখন ভুলে যাই। ৩১০ থেকে ৩৭০ শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি বর্গের মধ্যে বেশ সহজ জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে আমরা দেখতে পাই। ৩৭০ থেকে ৩৯৫ ডিগ্রী বায়োমেট্রিকের মধ্যে, গোঁড়াভাব সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের সন্ধান পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর লোকেরা পুস্তকে ছাপার হরফে না দেখা পর্যন্ত নূতন কোন কিছু-রি অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। ৪০০ ডিগ্রীর ওপরে আমরা মুক্ত মনের মানুষদের সন্ধান পাই। এই পর্য্যায়ের ব্যক্তিরা গোঁড়ামীর পরিবর্ত্তে নিজের যুক্তি এবং বুদ্ধির ওপরেই

নির্ভর করেন বেশী। বিখ্যাত ব্যারিস্টার, ঔপন্যাসিক, রাজনীতিক, শাসনকর্ত্তা, বড় বড় ব্যবসায়ী, অর্থনীতিবিদ্, সৈন্যবিভাগের কর্ত্তা, বড় বড় ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক এবং সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিবর্গকে আমরা এই শ্রেণীতে পাই। বড় বড় চিত্র তারকা এবং বিখ্যাত অভিনেতাদের, ৫১২ ডিগ্রী থেকে ৫৩০ ডিগ্রীর ভেতরে দেখা যায়।

সব চাইতে রহস্যজনক হচ্ছে মানুষের মন। মনস্তত্ব মানুষের মন ও হাবভাব বোঝবার পক্ষে সহায়ক। কিন্তু এতে মনস্তত্ব খুব কম আলোই প্রদান করে থাকে।

মস্তক থেকে মস্তিষ্ক বিকিরণের পরিমাপ ছাড়াও, কোনও ব্যক্তির হস্তাক্ষর, কিম্বা নাম সই, অথবা তার হাতের আঁকা কোনও বস্তু থেকেও তার পরিমাপ পাওয়া যায়। মস্তিষ্কের বিকিরণের পরিমাপ, মানুষের বর্ত্তমান অথবা একশত বৎসর পূর্ব্বের হস্তাক্ষরের বিকিরণের পরিমাপের সঙ্গে সমান। অতএব মানুষের মৃত্যুর পরও যে তার মস্তিষ্ক বিকিরণের পরিমাপ নির্দ্ধারণ সরা সম্ভব, এটাও স্বচ্ছন্দে প্রমাণিত হয়েছে।

আজ আমি খুব সংক্ষেপে মস্তিষ্ক বিকিরণ সম্পর্কে তোমাদের একটু আভাস দিয়ে রাখলুম। বিদেশ থেকে রশ্মি পরীক্ষার যন্ত্রপাতিগুলো খুব শীগগিরই এখানে এসে পড়বে, এবং সেই সঙ্গে রেডিয়াম-রশ্মি এবং রঞ্জন-রশ্মি সংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ যন্ত্রপাতিগুলোও আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেগুলো সব এসে পড়লে, আমি বিষদ ভাবে এ বিষয়ে তোমাদের অনেক কিছুই শেখাতে পারবো।

আমি জানি, তোমরা অনেকেই হাসপাতালের ডিউটীতে অধিকাংশ সময় নিযুক্ত থাকো। এ হাসপাতালে মানসিক রোগগ্রস্থ রোগীর অভাব নেই। কিন্তু তাদের আচার ব্যবহার দেখে শুনে, তোমরা যদি তাদের রোগটা, হাসিঠাট্টা করে উপেক্ষা করো,—অথবা তাদের ভয় করে দূরে দূরে সরে থাকো, তাহলে কিন্তু তোমাদের অনুসন্ধিৎসা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যাবে। মানসিক বিকার গ্রস্থ রোগী, সে যেমনই হোক ; অথবা তার রোগ যত উৎকটই হোক না কেন,—তোমরা তার প্রতিটি হাব-ভাব এবং গতিবিধি অত্যন্ত গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করবার চেষ্টা করবে। বারান্তরে এই সব রোগী সম্বন্ধে তোমরা যত বেশী আমাকে প্রশ্ন করবে, তত বেশী আমি তোমাদের ভেতর থেকে, শ্রেষ্ঠ ছাত্রছাত্রী বেছে নিয়ে, তাদের উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কে আরো মনোযোগী হ'তে পারবো।

সেবার চাইতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এ সংসারে আর কিছুই নেই। অজানা, অসহায় মানুষের রোগ মুক্তির সেবাই হচ্ছে ডাক্তারী জীবনের প্রধান এবং প্রথম শিক্ষনীয় বিষয়। কাজেই তোমরা যারা সত্যিই লোক সেবার প্রবৃত্তি নিয়ে ডাক্তারী পড়তে অগ্রসর হয়েছো, তাদেরকে একাগ্রচিত্ত এবং সেবা পরায়ণ হতেই হবে। আর যাদের তাতে আপত্তি রয়েছে, তারা এখন থেকেই বিভিন্ন শিক্ষার—বিভিন্ন পথ ধরে, কাজে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করো ; নইলে শেষ পর্যন্ত দু'কুলই নষ্ট হয়ে যাবে। আজকের মত আমার বক্তব্য এইখানেই শেষ।"

জীবন-সংগ্রাম

হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরেই মিনা সেদিন মাধবীকে বললো—"আর তোমায় ভাবতে হবে না বউদি, দাদার জন্য সরোজ সেবা সদনে বেডের ব্যবস্থা করে এসেছি। আজ বিকেলেই দাদাকে ভর্ত্তি করে দেবো।"

তেরো

হাসপাতালের বিরাট কক্ষের মাঝখান দিয়ে সরু পথ। দুধার দিয়ে রোগীদের সারি সারি শয্যায় নানা রকমের রোগী শুয়ে রয়েছে। কেউ বা বিড়বিড় করছে, কেউ বা হাত মুখ নাড়ছে, কেউ বা মুখে নানা রকমের কথা উচ্চারণ করে হাসছে। কেউ বা মাঝে মাঝে উন্মাদের মত চেঁচিয়ে উঠছে। কেউ বা বসে বসে কাঁদছে।

এই হল-ঘরটার দু'পাশে, দু'খানা টেবিলের পাশে মাত্র দু'খানা করে চেয়ার সাজান ছিল। মোট চারটি নার্স ঐ চেয়ার টেবিল গুলোতে, এক একবার রোগীদের তদ্বির তদারক করে, ফিরে ফিরে এসে বসছিল। আগাগোড়া সাদা নার্সের পোষাকে মিনা এই কক্ষটিতে ঘুরে ঘুরে, এক একজন রোগীর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে—তাদের, কিসের, কোথায়, অসুবিধে হচ্ছে, তাই জিজ্ঞেস করে বেড়াচ্ছিল। হাসপাতালের এই কক্ষটিতে বিশেষ ভাবে মানসিক রোগগ্রস্ত রোগীদের বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

—"শুনছো মা ঠাকরুণ ?" একজন রোগী হাত ইসারায় মিনাকে ডেকে বললো। মিনা তার দিকে ফিরে চাইতেই রোগীটি তখন বিছানায় উঠে ব'সে, হাত মুখ নেড়ে, মিনার দিকে চেয়ে বোলতে সুরু করলো—"বলি তোমাদের আক্কেল খানা কি বোলতে পারো ? হারানো মেয়েটা, আমার কাছে রোজ আসতে চাচ্ছে ; আর রোজ রোজ তোমরা তাকে গেটে বাধা দিচ্ছ কেন ?" তারপর উত্তেজিত হয়ে সে বলে উঠলো "আমি শুনতে চাই তোমরা তাকে আমার কাছে আসতে দেবে কি না ? my only doughter, তা জানো ?"

কথা শুনে, স্মিত হাস্যে মিনা সেই প্রৌঢ় রোগীর দিকে এগিয়ে গিয়ে বললো,—"তুমি ভুল কোরছো বাবা ? আমিই তো তোমার সেই মেয়ে ! চিনতে পারছ না ?"

প্রৌঢ় রোগীটি তখন দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলতে সুরু করলো,—"তুমিই যদি সেই—তবে ডাক্তারণীর পোষাক পরেছ কে'ন ? কলসী কাঁখে ঘাট থেকে কৈ জল তো আনতে দেখিনি ? ভেট্‌কী মাছের ঝোল রাঁধতে জানো ? কোথায় তোমার সেই জর্জ্জেট শাড়ী খানা ?—আমি পূজোতে যেটা দিয়েছিলুম ?" তারপর বিড়বিড় করে সে বকতে সুরু করলো,—"সে চেহারা নয়, সে কথাবার্ত্তা নয়, সে রকম শান্ত শিষ্ট নয় ; বাবা বলতে অজ্ঞান ছিল !—কামিনী মা আমার, বাবা বোলতে অজ্ঞান হোত ! ন্যাকামী করে আমার কাছে কামিনী সাজতে এসেছ ?" বলেই লোকটা হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে,

বিছানার বালিশে মুখগুজে, শুয়ে শুয়ে কোঁপাতে লাগলো। রোগীটি নূতন ভর্ত্তি হয়েছিল। একজন নার্স তার এমনি ব্যবহার দেখে, মিনার কাছে এগিয়ে গিয়ে ব্যাপারটা জানতে চাইলো। সেই রোগীটির মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে, মিনা তখন নার্সটিকে অতি আস্তে জানালো, কন্যা সন্তান ছিল এই ভদ্রলোকের মাত্র একটি। এবং সেই মেয়েটিকে ইনি প্রাণাধীক ভালবাসতেন। মেম-টিচার রেখে মেয়েটিকে ভালভাবে লেখাপড়া গান বাজনা শিখিয়ে ছিলেন ইনি। হঠাৎ একদিন বিশুচিকা রোগের আক্রমণে, মাত্র ৪৮ ঘণ্টা রোগ ভোগ করে মেয়েটি মারা যায়। তারপর থেকেই ভদ্রলোকের মাথা খারাপ হয়েছে। এঁর পয়সা, কড়ি, বাড়ী, গাড়ী, পুত্র, পরিবার ইত্যাদি, আর কিছুরই অভাব নেই, কিন্তু মেয়ের মৃত্যুর পর থেকেই এঁর এই অবস্থা!"

একটি দীর্ঘ নিশ্বাস মোচন করে নার্সটি ধীরে ধীরে মিনার কাছ থেকে সরে গে'ল।

অদূরের একটি শয্যার পাশে গিয়ে একজন নার্স, একটি মানসিক বিকারগ্রস্থ রোগীকে খাবার দিচ্ছিল। মাথার পাশের টেবিলে খাবারটা নামিয়ে রাখতেই, যুবক ছেলেটি দু'হাতে নার্সটির ডান হাত খানা জড়িয়ে ধরে বললো,—"অবিকল তোমার মতন!" তার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল্ করে চেয়ে চেয়ে সে তারপর বোলতে সুরু করলো,—"না—না, ভুল হবার যো নেই! সেই নাক, সেই মুখ, সেই চক্ষু দুটি!

হতভাগারা আমায় বিয়ে করতে দিলে না!" তারপর নার্সের হাতটি সহসা ছেড়ে দিয়ে সেই যুবক, তার বালিশের ওপর একটা প্রচণ্ড ঘুঁষি মেরে বোলতে সুরু করলো,—"আমি এর শোধ নোবই কিছুতেই ক্ষমা কোরবো না। এ সংসারে ক্ষমা নেই! চাণক্যই বলেছিল বোধহয়। হৃদয়ের যে যন্ত্রণা ভেতরে টগ্‌বগ্‌ করে ফুটে ফুটে, আমাকে দগ্ধে দগ্ধে মারছে; দুটো মিষ্টি কথা, দু'ফোঁটা সখের চোখের জল সেখানে তুচ্ছ!" তারপর অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে, বিকৃত কণ্ঠে যুবক বলে উঠলো,—"আমি খুন কোরবো। শশীকান্তকে আমি খুন কোরবো! তার মাথা দিয়ে আমি ফুটবল···" পর্যন্ত বলা শেষ হতে না হতেই, সেখানে দু'জন নার্স, বিষ্টু ডাক্তার এবং মিনাকে হাজির হ'তে দেখে, যুবকটা বিছানায় এলিয়ে পড়লো।

বিষ্টু ডাক্তার বললো,—"এঁকে তেইশ নম্বর রুমে Transfer করে দিন! এখানে থাকলে অন্যান্য রোগীরা ভয় পাবে!"

মিনা বিষ্টু ডাক্তারকে প্রশ্ন করলো,—"কি হয়েছে ওঁর?" একটু মুচকি হেসে, বিষ্টু ডাক্তার অপর রোগীর বিছানার দিকে যেতে যেতে ফিরে চেয়ে, মিনার কথার উত্তরে বললো! "প্রেমে পড়েছিল, কিন্তু বিয়ে হয় নি। আর কিছু নয়!" ডাক্তারের কথা শুনে মিনা সহসা লজ্জায় যেন রাঙা হয়ে উঠলো। তারপর মাথা নীচু করে সে বিপরীত দিকে চলে গেল।

বিলাসের পাশের সিটের একটি রোগীর বক্ষ পরীক্ষা করে বিষ্টু ডাক্তার, ষ্টেথিস্কোপটা কোটের পকেটে পুরতে পুরতে বিলাসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। তাকে আসতে দেখেই বিলাস সুরু করলো—

"—অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া জানে না সন্তরণ"
ডাক্তার তুমি বাঁচাইবে কারে? বল তো করিয়া পণ?

গম্ভীরভাবে ডাক্তার বলে উঠলো,—"দেখি একবার বুকটা?" হাত দু'খানা উঁচু করে বিলাস বোলতে সুরু করলো,—"বুক দেখে কি করবে ডাক্তার? ও তোমার ষ্টেথিস্কোপ আর থারমোমিটারে হবে না! খাওয়ার চাই ডাক্তার, খাওয়ার চাই—বুঝলে? অর্থাৎ—

"যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ ভূমে রনিবে না—
বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত—
আমি সেই দিন হ'ব শান্ত।"

ডাক্তারের বুক পরীক্ষা শেষ হলে বিলাস বললো—"কি দেখলে ডাক্তার?—

"আমি বন্ধন হারা কুমারীর বেণী, তন্বী নয়নে বহ্নি,
আমি ষোড়শীর হৃদি সরসিজ প্রেম, উদ্দাম, আমি ধন্যি।"

কিন্তু আমার মাধবী কোথায় ডাক্তার? তুমি আমাকে আমার স্ত্রী পুত্র থেকেও বঞ্চিত করেছ! যে দিন মুক্তি পাবো সেদিন তোমায় কি করবো জানো ডাক্তার?—আমি তোমায় বধ কোরবো! 'তুমি আমাকে সম্রাট করেছ! তুমি আমায় নরকে নিক্ষেপ করে আবার স্বর্গে উঠিয়েছ! আমি তোমায় বধ ক'রে, তোমার মূর্ত্তি গড়িয়ে পূজো কোরবো! না-না, এ কি! এ আনন্দ না-দুঃখ্যু? এ যে—এ-যে না,—একটা কিছু করতে হবে, যাতে বুঝতে পারি, যে আমি বেঁচে আছি—হাঃ—হাঃ—হাঃ!' কেমন অবিকল চাণক্যের মত বলতে পেরেছি কি না? বলো ডাক্তার তুমিই বলো—? অবিকল আমি চাণক্যের ম'ত তোমায় বলতে পেরেছি কি-না?"

বিষ্টু ডাক্তার একটু মুচকি হেসে বললো,—"হ্যাঁ অবিকল চাণক্যের মতই বলেছেন। এবার শুয়ে পড়ুন। পরে আসবো।" বোলতে বোলতে ডাক্তার চলে গে'ল। বিলাস তার গমন পথের দিকে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থেকে শেষে বিছানায় বসে পড়লো!

কাজ শেষ করে বিষ্টু ডাক্তার একটা লম্বা প্যাসেজ পেরিয়ে নিজের অফিস কক্ষের দিকে অগ্রসর হ'তে যাবে, এমনি সময়ে প্যাসেজের পাশের গাড়ীবারান্দায় দাঁড়িয়ে, একজন রোগী অন্যমনস্ক ভাবে, হাতের দোতারা-টা বাজাতে বাজাতে গেয়ে উঠলো:—

গান

বন্ধু, মনের কথা কইব কারে
তুমি নাই আমার।
তাইতো আমার পরাণ কেঁদে—
ফেরে সাগর পার ॥
(বন্ধু তুমি নাই আমার)
আঙ্গিনায় মোর বকুল ঝরে
শিউলি ভেজে শিশির নীরে,
মলয় বহে, কোকিল ডাকে ;—
ফাগুন-অভিসার ॥
(বন্ধু তুমি নাই আমার)
লতা জড়ায় তরুর দেহ
গভীর প্রেম ডোরে,—
(ওগো) তুমিও এমনি ছিলে
আমায় বুকে ক'রে ;
মনে কি পড়ে না কভু ?—
তোমায় ভেবে আজিও তবু,
নীল যমুনার তীরে যে ফিরি
কতই বারে বার !
(বন্ধু তুমি নাই আমার)

গানখানি শেষ হবার সময় মিনা একজন নার্সের সঙ্গে কথা বলতে বলতে, সেই প্যাসেজটির মুখে থেমে দাঁড়ালো। নার্সটি মিনাকে প্রশ্ন করলো—"এর তো কোনও মস্তিষ্কের

দোষ রয়েছে বলে মনে হয় না? একে তবে এখানে এনে রাখা হয়েছে কেন?" মিনা উত্তর দেয়,—"একটি মেয়ের প্রেমে প'ড়ে, এই লোকটি যৌবনে তাকে নিয়ে দেশান্তরি হয়েছিল। কিন্তু অর্থাভাবে, আর সাংসারিক অভাব অনটনের তাড়নায়, শেষ পর্যন্ত সেই মেয়েটি,—এই লোকটীর সঙ্গ ছেড়ে কোথায় যেন চ'লে যায়। সেই থেকে এই লোকটী না খেয়ে,—না ঘুমিয়ে, অনবরত তার সন্ধান করতে করতে, একদিন একটা রাস্তার দেয়াল পঞ্জিতে সেই মেয়েটীর চেহারা এবং নাম দেখতে পেয়ে, পাগল হয়ে যায়। তারপর থেকে, মেয়ে মানুষ দেখলেই তাকে তেড়ে মারতে যেতো। পারার লোকে ওঁর এই সব উৎপাৎ সহ্য করতে না পেরে, ওঁকে এইখানে স্থানান্তরিত করেছে। আর ঐ গান গাওয়াটা হচ্ছে ভদ্রলোকের অনেকটা স্বাভাবিক মনের অবস্থা। উনি এখন অনেকটা প্রকৃতিস্থ অবস্থায় রূপান্তরিত হয়েছেন। সঙ্গীত বিদ্যাটা বোধ করি ওঁর স্বভাবগত বস্তু। উনি কোনকালে যে একজন ভাল গায়ক ছিলেন, তা ওঁর আজ-কালকার গান শুনে আমরা বুঝতে পারি।"

দোতারা হাতে লোকটির দিকে, অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে নার্স'টি বলে উঠলো,—"ওমা! ঐ দেখুন দিদি কেমন কট্‌মট্ করে তাকাচ্ছে লোকটা আমার দিকে। কী সর্ব্বনাশ! ঐ দেখুন—এই দিকেই আসছে যে!" নার্সের কথা শুনে মিনা একবার পেছন ফিরে দেখেই বললো,—"ভয় পাবেন না ধীরে ধীরে চ'লে আসুন।"

চোদ্দ

রাত্রি ১০টার পর সেদিন হাসপাতালে নিজের চেম্বারে ব'সে বিষ্টু ডাক্তার তার প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালের গত দেড় বৎসরের কথা রোমন্থন করে, মনে মনে তৃপ্তি অনুভব করছিল। এমনি সময়ে শেফালি তার চেম্বারে প্রবেশ করলো। গলায় তার একটা ষ্টেথিস্কোপ ঝুলছিল। আঁটসাট দেহের গড়ন। পরনে একখানা পরিষ্কার চওড়া কালো পেড়ে শাড়ী। শাড়ীর আঁচলে তার কোমর বেশ শক্ত করে জড়ানো। গায়ের সাদা ব্লাউজটিতেও তাকে সুন্দর মানিয়েছিল। হাতে দু'গাছা করে সরু চুড়ি আর কানে ছিল সাধারণ দুটি টব্। পায়ে একজোড়া সাধারণ স্যাণ্ডেল।

চেম্বারে ঢুকেই শেফালি ডাক্তারের সম্মুখে চেয়ারে উপবেশন করলো।

ডাক্তার প্রশ্ন করলো—"এত রাত্রে হঠাৎ কি মনে করে এলেন? ডিউটি দিচ্ছেন বুঝি কো'ন ওয়ার্ডে? কিছু প্রয়োজন আছে আমাকে এক্ষুনি?"

বিষ্টু ডাক্তারের উৎফুল্ল মুখের দিকে চেয়ে, শেফালি হাসতে হাসতে বলে,—"আমি শুধু শুনতে এসেছি, আপনার দু'নম্বর ওয়ার্ডের আঠারো নম্বোর বেডে, যে রোগীটিকে আজ ভর্ত্তি করা হয়েছে, ওঁর উত্তেজনা তো ক্রমেই বাড়ছে দেখতে পাচ্ছি। ওঁকে কি মরফিয়া ইনজেকশন্ দেবো? আশ-পাশের

রোগীরা তো ঘুমুতেই পারছে না ওঁর হৈ-হুল্লোড়ে।" সহসা চিন্তিত ভাবে ডাক্তার বললো—,"ওঁর জন্য আপনাকে ভাবতে হবে না। ডক্টর ঘোষ এবং মৈত্র, দু'জনেই আজ পর পর চারটে ওয়ার্ডের রোগীদের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। প্রয়োজন হলে তাঁদের কাউকে ডেকে বোলবেন, ওঁরাই তার ব্যবস্থা করবেন।" তারপর, আকস্মিক উৎসাহিতের মতো, একটু আলাপ করার ভঙ্গিতে, বিষ্টু ডাক্তার শেফালিকে প্রশ্ন করলো—"কেমন লাগছে আপনার এই সব হাসপাতালের কাজকর্ম ?"

"—দিনের বেলায় বেশ ভালই লাগে। রাত্তিরের দিকে ডিউটী দিতে একটু ভয় ভয় করে",—বলে শেফালি একটু হাসলো।

শেফালির মুখের দিকে চেয়ে, মৃদু হেসে, ডাক্তার বলে,—"অসহায় রোগীদের রোগ যন্ত্রণা দেখে তো দুঃখ্যুই হবার কথা। তাতে তো ভয় পাবার কথা নয়। 'ভয়' একটা বিশ্রী রোগ।"

সলজ্জ হাসি মুখে, ডাক্তারের কথার একটা যুক্তযুক্ত উত্তর দেবার কথাই হয়তো শেফালি ভাবছিল ; এমনি সময়ে হন্তদন্ত হয়ে, ন্যাড়া বক্ষে প্রবেশ করেই বলে উঠলো—"বিষ্টুডা, টোমার ঐ টিন নম্বোর রোগী-টা আমাকে টিষ্টোতে ডিচ্ছে না! ডেখ্‌লেই শুটু হুকুম করবে। মিনাডিটা কখন সেই রাত্তিরে ডিউটীতে আসবে, আমি টটোক্ষণ কিছুটেই ঐ রোগীটার পাশে ঠাকৃতে পারবো না। টুমি অন্য ব্যবস্থা ডেকো।"

ন্যাড়ার কথা শুনে, শেফালির মুখের দিকে চেয়ে, ডাক্তার প্রশ্ন করলো,—"তিন নম্বোর বেডে কে রয়েছেন বলুন তো ?"

"Mr B. Roy. ধীরেন বাবুর বাড়ীর সেই ভাড়াটে ভদ্রলোক।" তারপর, ন্যাড়ার দিকে চেয়ে শেফালি বলে উঠলো—"তিনি তো কাউকে বিরক্ত করেন না ?"

ভীতিবিহ্বল নেত্রে, শেফালি আর বিষ্টু ডাক্তারের দিকে চেয়ে, ন্যাড়া বলে,—"বিরক্ট্ আবার করে না ! কোটা ঠেকে কটক্-গুলো—অঙ্কের হরফ্ নিয়ে এলো পর পর সাজিয়ে। আমায় বলে কি না ডোগ্ করে দাও ! অঙ্ক টো অঙ্ক, টার আবার ডোগ্ কোরবো কি ? অঙ্কের, ৯ টাকে ডেক্‌লেই আমার হাসি পায় এমন যে, টা আর বোল্‌টে পারিনে। ঠিক ডে'ন সেই সারকাসের ঠ্যাং টোলা ডোকারগুলোর মটো। আর ২-টা ডেন পাটিহাস।" তারপর হাত দিয়ে বক দেখানোর মতো করে, দেখিয়ে সে বলে, "গলাটা বাড়িয়ে ডেন চলেছে টো চলেইছে। আর-আর-ঐ যে অঙ্কের ৫-নম্বোরটা না ?—উরে—বাপ্‌রে ! ওটা ডে'ন আমাকে ডেক্‌লেই, হাঁ করে গিলে খেটে আসে ! ওডের আবার ডোগ্ করবো কি ?"

সহাস্য মুখে ডাক্তার বলে—"তুমি বল্‌লেই পারতে,—ও আমি জানি না ; তবেই তো মিটে যেতো।"

—"টাইটো বলেঠিলুম ! টখন বলে কিনা,—বাইরণের ঠেই কবিটা টা ব'লতে পারো ?—ওটেন্ ?" "ন্যাড়ার কথা শুনে শেফালি, ডাক্তারের দিকে চেয়ে, মৃদু হেসে প্রশ্ন করে, 'বায়রণের, দি ওস্তন্' কবিতার কথা বলেছিলেন বোধ হয় ?"

ন্যাড়ার কথা মন দিয়ে শুনতে শুনতে, উৎসুক হাসি মুখে

ডাক্তার "হ্যাঁ" বলেই,—ন্যাড়ার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে, "আর কি কি বলেছিলেন তারপর শুনি ?"

হাতের কর গুণে, ন্যাড়া মুখে কি যেন বিড়বিড় করে নিয়ে, হাত পা নাচিয়ে তখন ব'লে ওঠে,—"ডাড়াও আগে মনে করে নি! কি সব বিড্ঘুটে কঠা রে বাবা!" বিলাসের বলা কথা গুলো ন্যাড়া মনে মনে রোমন্থন করে নিয়ে তারপর সে বলে,—"ঠিক মনে পড়েছে। ঠুনে ডাও!—এক নম্বোর বল্লে,—পিটার ঠাহেবের 'ঠলিলোকি' কবিটা-টা বলো। টারপর বল্লে,—'ঠেইলার বয়' 'ঠেইলার বয়', টেলিঠন্ ঠাহেবের কবিটার কথা—। ঠেশ কালে ডখোন বল্লে,—হয় 'লুঠি গ্রে',—নয়টো টেলিঠন ঠাহেবের 'নাইট ব্রিটেট' টোমাকে বলটেই হবে, টখন ভয়ে আমার বুকের ভেটর টা, এমন ঢিপ্ ঢিপ্ করটে লাগলো ডে আমি ঠুটে পালিয়ে এলুম। টোমার অমন ডাকাটে রোগীর কাছে আমি ঠাক্তে পাল্লুম না বিষ্টুডা! বই পড়ার কঠা বল্লে আমার গায়ে জ্বর আসে! ঠোটো বেলায় টাঁপাটলা পাট্ঠালার ডিগিন মাষ্টার আমাকে কড়ি কাঠে ঢুলিয়ে মারঠে টেয়েছিল, ইংরেডি পড়টে টাইনি বলে! ঠেই ঠেকে, ভয়ে ইট্কুল ডিলাম ঠেড়ে। ঠেই আমাকে বলে কি না—ইংরেডি কবিটা বল্টে! বাপ্রে বাপ্—টুমি অন্য লোকের ব্যবস্টা ডেখো। আমাড্ডারা হবে না!"

ন্যাড়ার কথা শুনে, শেফালি ইতিপূর্ব্বেই মুখে রুমাল চাপা দিয়ে হাসতে শুরু করেছিল। বিষ্টু ডাক্তার হাসতে হাসতে ন্যাড়াকে

বলে,—"তা তোমাকে তো খারাপ কোনও কথা বলেননি ?—'ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের লুসী গ্রে' 'বাইরণের' 'দি ওস্যান' 'সেকস্‌পিয়রের 'হ্যামলেটস্‌ সলিলোকি,' 'টেনিসনের' 'চার্জ্জ্‌ অফ্‌ দি লাইট্‌ ব্রিগেড্‌' এর প্রত্যেকটা কবিতাই খুব ভালো,—তুমি কোথায় আগ্রহ করে কবিতাগুলোর অর্থ তাঁর কাছে শিখে নেবে, না—তুমি এলে ভয়ে পালিয়ে ? আচ্ছা বোকা লোক তো !"

দু'হাত যোড় করে ন্যাড়া বলে,—"রক্ষে' করো আমার আর বুড়্‌ঢ্যি হয়ে কাড্‌ নেই ! ভেবেঠিলুম টুমি একটা বড় ডাক্টার, টা ডেক্‌ছি টুমিও ঐ ঠাগলটার মটোই আবোল টাবোল বোকটে স্বুরু কল্লে ? আমি টল্‌লুম মিনাডির কাছে। টোমাড্ডারা কিট্টু হবে না।" বলতে বলতে ন্যাড়া হন্‌ হন্‌ করে হেঁটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ! বিষ্টুডাক্তারের উপর্য্যুপরি ডাকেও সে আর একটী বার ফিরে চাইল না।

ন্যাড়ার কাণ্ড দেখে শেফালি প্রশ্ন করে—"এ আপনার কেউ হয় বুঝি ?"

হাসতে হাসতে মাথা নেড়ে ডাক্তার বলে,—"আমার আপন আত্মীয় কেউ নয়। তবে খুব পরিচিত, এবং সে পরিচয়ের প্রথম এবং প্রধান হেতু হচ্ছে, ওর তোত্‌লানো রোগ—আর স্বভাব চাঞ্চল্য !"

ডাক্তারের কথা শুনে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি শেফালি প্রশ্ন করে, "তোত্‌লানো আর স্বভাব চাঞ্চল্যটাও মানুষের রোগ নাকি ?"

"নিশ্চয় ! ওকে আমি এতদিন নেচারস্‌ ট্রিটমেণ্ট করে

দেখলুম। অনেকটা ভালো হয়েছে। বাকী যেটুকু রয়েছে তার জন্য হয়তো আমাকে অন্য উপায় অবলম্বন করতে হবে! একটা বস্তু ওর ভেতরে আপনি লক্ষ করেছেন কি না জানি না! লোকটা ইন্‌হার্ট অত্যন্ত সরল! শিশুকালে ও'র প্রবল টাইফয়েড্ হয়, সেই থেকেই ও অত্যন্ত অন্যমনস্ক এবং তোত্‌লা হয়েছে,—এটা হচ্ছে ওর বাবার রিপোর্ট! কিন্তু ওর মস্তিষ্ক পরীক্ষা থেকে আমরা বুঝেছি, যে কোনও সাহসিকতা পূর্ণ কাজ ওর দ্বারা সম্পূর্ণ সম্ভব। এবং এই লোককে সম্পূর্ণ রোগ মুক্ত করতে পারলে, এর দ্বারা যে কোনও গঠনমূলক কাজের সাহায্য হতে পারে।"

—"কিন্তু লেখাপড়ার কথা শুনলেই তো ও ভয় পায়, গঠন মূলক কাজ করতে হলে বিদ্যা বুদ্ধি চাইতো ?"

"আপনি ভুল করছেন, আসলে ওর সেন্স্-অরগ্যানটাই হচ্ছে ডিফেক্‌টিভ্; এবং সেইটেই হচ্ছে ওর আসল রোগ। ওর কণ্ঠনালির যেটুকু জড়তা রয়েছে, সেটা অপারেশনে অনেকটা ভাল হতে পারে, কিন্তু আসলে ওর দোষ হচ্ছে সেন্স্-অরগ্যানে! আপনি ওর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বললে সহজেই বুঝতে পারবেন, 'ভিউ' ওর ভিতরে দু'টোই পুরোপুরি রয়েছে। একদিকে ও যেমন পেসিমিষ্ট্, অন্যদিকে দেখবেন ও আবার অপ্‌টিমিষ্ট্ও বটে। যে কোনও ব্যাপারে ভয় পাওয়ার অবস্থাটা হচ্ছে ওর আকস্মিক, কিন্তু সেটা ক্ষণস্থায়ী। দেখলেন তো ?—এত যে ডাকলুম এখন ও সাড়া দিলে না, কিন্তু আগামী

কালই দেখতে পাবেন ও আবার ঠিক আমার কাছে এসে হাজির হয়েছে !"

—"আপনার কি মনে হয় ওকে সারিয়ে তুলতে পারবেন ?"

চিন্তিতভাবে—ডাক্তার উত্তর দেয়,—"আশা তো কচ্ছি বড়জোর আর মাস তিনেক সময় লাগতে পারে। তবে যদি ও, এরি ভেতরে আবার কোনও একটা বড় অসুখে পড়ে, তা হলে ওকে সারিয়ে তোলা মুস্কিল হ'য়ে উঠবে !"

"—আচ্ছা ডক্টর চৌধুরী,—মেণ্টাল ডিজিজ্ মানুষের ক'ত রকমের হতে পারে ?—"বলেই শেফালি সহাস্য মুখে ডাক্তারের মুখের দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

বিষ্টু ডাক্তার উত্তর দেয়,—"মনুষ্য চরিত্রের সব কিছু অতিরিক্তভাকেই আপনি ডিজিজ্ বলে ধরে নিতে পারেন !"

"—তার মানে ?"

"—যেমন ধরুণ অতিরিক্ত হাসা, অতিরিক্ত কান্না, অতিরিক্ত ভদ্রতা, অতিরিক্ত নিষ্ঠুরতা, অতিরিক্ত ন্যাকামো, অতিরিক্ত কর্ম্মতৎপরতা। আরো কতো রয়েছে, বলে তো সব কিছু বোঝাতে পারবো না। এই হাসপাতালের বিভিন্ন রোগীদের, মাঝে মাঝে ভিন্নভাবে একটু পরীক্ষা করবার চেষ্টা করবেন, তাহলে অনেক কিছুই শিখ্তে পারবেন।"

এমনি সময়ে সুসজ্জিতা নার্সের বেশে সেই কক্ষে প্রবেশ করেই মিনা ডাক্তারকে বলে উঠলো, "—আপনি এখনো শুতে যান নি ? রাত কতো হয়েছে—তা জানেন ?"—বলেই সে

ডাক্তারের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে, সন্দিগ্ধ-হিংস্র দৃষ্টি মেলে শেফালির দিকে চেয়ে রইল।

মিনার সেই ক্রূর দৃষ্টির দিকে নজর পড়তেই, শেফালি উঠে দাঁড়িয়ে, বিশুষ্ক মুখে ডাক্তারের দিকে চেয়ে, একটা নমস্কার জানিয়েই কক্ষ থেকে বেরিয়ে পরলো!

পাশের একটা চেয়ার টেনে নিয়ে, বস্‌তে বস্‌তে মিনা বললো—"আপনিও তাহ'লে দল ছাড়া নন্ দেখছি?"

—"কোন-দল?—কিসের দল বলছেন?" বলে, উৎসুক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বিষ্টু ডাক্তার, মিনার দিকে চেয়ে চেয়ে তার মনের অবস্থাটা বোঝবার চেষ্টা করতে লাগলো।

কক্ষের দেয়ালের দিকে চেয়ে মিনা জবাব দেয়— "ঐ বল্লুম একটা কথা।" তারপর ফোঁস্ করে একটা রুদ্ধ নিশ্বাস ত্যাগ ক'রে মিনা একটু নড়ে বসলো।

মুচ্‌কি হেসে ডাক্তার বলে—"এই হাসপাতালের রোগীদের দেখে দেখে আপনারো শেষে রোগ ধোরলো নাকি? বলুন, তা হলে আপনার জন্য আবার একটা বেডের ব্যবস্থা দেখি!"

"—থাক্ আর আমার বেডের জন্য আপনাকে ভাবতে হবে না! ইতিপূর্ব্বে যার বেডের ব্যবস্থা করেছেন তাকেই আগে সুস্থ করে তুলুন!"

সহসা, বিষ্টুর প্রতি মিনার তীব্র কটাক্ষপাত, আর তার কথা বলার ভঙ্গি লক্ষ্য করে, ডাক্তার ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে অন্যমনস্কের ম'ত কি যেন ভাবতে লাগলো।

মিনা তাই দেখে মনে মনে ভাবলো,—ঠিক জব্দ হয়েছে! তখন সে বললো,—"কি ভাবছেন অত? বিলেতে ফেলে আসা শ্বেতাঙ্গিনী ভাবি প্রেয়সীর কথা? নাকি ইতিপূর্ব্বে যার বেডের ব্যবস্থা করলেন তারি কথা?—তা অ'ত ভাবছেন কেন? আমি তো এক্ষুনি চলে যাবো,—তা ছাড়া আপনার মতন একজন স্বনামধন্য পজিশন্যাল্ লোকের নামে দুর্নাম রটিয়ে নিজের পজিশন্ নষ্ট করবার ম'ত আকাঙ্ক্ষাও আমার নেই!"

মিনার কথা শুনতে শুনতে ডাক্তার রীতিমত বোকা সেজে কিছুক্ষণ বসে থাক্‌লো। তারপর বল্‌লো—"সত্যিই আপনার কথা আমি পরিস্কার কিছুই বুঝে উঠতে পাল্লুম না। কি বল্‌তে চাচ্ছেন আপনি? যদি খোলাখুলি বলতেন তা'হলে সত্যিই খুশী হতাম!"

সহসা মিনার মনের গতি যেন ভিন্ন পথ ধরে চল্‌তে সুরু করলো। তাহলে বিষ্টু ডাক্তার বোধ হয় চরিত্রহীন নয়! হয়তো হাসপাতাল সংক্রান্ত কোন কথাই সে শেফালির কাছে বলছিল! মিনাই হয়তো বুঝতে ভুল করেছে। বিষ্টু ডাক্তার বোধহয় অপবিত্র নয়! এমনি সব নানাকথা তখন মিনার মাথায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

সহাস্য মুখে মিনার দিকে চেয়ে ডাক্তার বললো—"কৈ আমার কথার জবাব দিচ্ছেন না-তো?" তারপর বলে, "বড্ড ঘুম পাচ্চে কিন্তু আমার। এবার যদি ছুটী দে'ন তাহলে একটু ঘুমিয়ে বাঁচি!"

—"কোথায় ঘুমুতে যাবেন শুনি ?"

—"কে'ন—ঐ তো কর্ণারেই বিছানাটা পাতা রয়েছে, দেখেও বুঝতে পাচ্ছেন না ?"

—"ওমা ! অমনি একটা রোগীর ম'ত বিছানা আপনার ? শোবার খাট কেনেননি বুঝি ? ওতে আপনি শুয়ে আরাম পান ? রাত্রের খাওয়া হয়েছে আপনার ?"

—"না,—ঐতো খাটের পাশেই ছোট টেবিলটাতে খাবার ঢাকা দেয়া রয়েছে।"

"—কি খাবেন আপনি রাত্রে ?"

"—দেখুন না একটু এগিয়ে গিয়ে।"

উৎসুক মিনা সহসা চেয়ার ঠেলে উঠেই ডাক্তারের খাবার টেবিলের পাশে গিয়ে প্লেটের ঢাক্‌নাটা তুলেই বলে উঠলো,—"ওমা একি ! তু'শ্লাইচ্ মাখন রুটি আর দুটো ডিম সেদ্ধ ! এই খেয়ে আপনার পেট ভরে ? মাছ, মাংস, পরোটা কিম্বা ভাত ডাল, তরকারী—সে সব তো কিছুই নেই দেখছি ? এই আপনার রাত্রির খাবার ?"

"—কে'ন আপনার বুঝি পছন্দ হচ্ছে না ? রাত্রে তো আমি ঐ সবই খেয়ে আস্‌ছি বহুদিন থেকে।" বলেই ডাক্তার চেয়ার ছেড়ে উঠে বিছানার পাশের কুজো থেকে একটা কাঁচের গ্লাসে করে একগ্লাস জল ঢেলে নিয়ে, খাবার টেবিলে গিয়ে বোসলো। তারপর বললো,—"আজ ভোর রাত্রে যখন আপনার ডিউটী অফ্ হয়ে যাবে, তখন যোগেন বাবুকে একবার বিলাস

বাবুর বেডটা, চারতলার ১৬ নম্বর কেবিনে রিমুভ্ করে দিতে বলে যাবেন।" তারপর খাবারের ঢাকনাটা তুলে, ডিম সেদ্ধ দিয়ে একখানা রুটীর শ্লাইচ্ মুখে পূরতে পূরতে বললো,—"বিলাসবাবুর রোগ সারতে বড়জোর আর হপ্তাখানেক লাগতে পারে।" তারপর খানিকটা জল পান করে নিয়ে, ডাক্তার বলে,—"মনে হচ্ছে এবার বাৎসরিক ফাংশ্যনে বিলাস বাবুই আমাদের সেক্রেটারীর কাজ করতে পারবেন। রোগীদের মধ্যে ওঁকে আর ফেলে রাখা যুক্তিযুক্ত নয় বলেই, চার তলার ঐ কেবিনের ব্যবস্থা ওঁর জন্যে করেছি।" তারপর ডাক্তার আবার খেতে সুরু কোরলো।

মিনা এতক্ষণ নিজেকে কোথায় যেন হারিয়ে ফেলেছিল। ডাক্তারের একটি কথাও তার কর্ণে প্রবেশ করেনি। জানালাব পথে অন্যমনস্ক মিনার চোখে তখন ভাসছিল, বিরাট প্রেতপুরীর ম'ত হাসপাতালটা। আর তার কাণে আস্‌ছিল, রকমারী রোগীর বুক চেড়া কাতরোক্তি, কখনো বা কারো কারো তীব্র আর্ত্তনাদ।

খাওয়া শেষ করে, ঘুম জড়ানো চোখে, তোয়ালেতে হাত আর মুখ মুছতে মুছতে, ডাক্তার বলে উঠলো,—"বেয়াদবি মাপ্ করবেন। এবার আমি শুয়ে পড়ছি কিন্তু!" ডাক্তারের কথা শুনে স্বপ্নোত্থিতের মতো উঠে দাঁড়িয়ে, মিনা বললো,—"ওঃ-হো! একেবারে ভুলেই গিয়েছিলুম! আমি ডিউটীতে যাচ্ছি। আপনি আপনার দরজাটা ভেজিয়ে দিন।" সে কথার উত্তরে

ডাক্তার বলে—"ওটা খোলাই থাকে, আমি শুধু ওই লাইট-টা ডিম করে দিয়ে শুয়ে পড়বো।" বলেই ডাক্তার বিছানার দিকে অগ্রসর হোল!

মিনা বলে—"এত খাটুনির পর ঘুম, এরপর যদি আবার ডাক্তার আর নার্সেরা আপনাকে ডেকে ডেকে জ্বালাতন করে? সেইজন্যই বলছিলুম। দরজাটা বন্ধ করেই ঘুমোলে হোত না?" "সহানুভূতির জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি! রাতের ভেতরে ডাক্তার আর নার্সদের কিছুটা বিরক্ত সহ্য করবো বলেই তো এই ব্যবস্থা করে নিয়েছি, আর তাতেই তো আমার আনন্দ! আপনি কিছু ভাববেন না, দু' ঘণ্টা ঘুমুলেই আমি আবার সতেজ হয়ে উঠবো;—আর সেটুকু সময় এঁরা আমাকে দিয়েও থাকেন। তাতেই তো আরামে ঘুমুতে পারি।" কথা শুনে মিনা আস্তে আস্তে ডাক্তারের চেম্বার থেকে বেরিয়ে পড়লো। তখন ডাক্তার গিয়ে, বিছানার পাশের ডিম লাইটের সুইসটা টিপে দিয়ে শুয়ে পড়লো!

মিনা একটা বারান্দার রেলিংএর ধারে এসে দাঁড়িয়েছিল। আজ আর তার কিছুই ভাল লাগছিল না। সমস্ত দেহ মন যেন তার, ঐ আত্মভোলা সর্ব্বত্যাগী মানুষটির কথাই শুধু ভেবে মরছিল। এমন সুশিক্ষিত, সর্ব্বগুণসম্পন্ন যুবক, কার জন্য, কিসের আশায়, এতবড় একটা কাজের দায়িত্ব মাথায় নিয়ে, রাতদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে মরছে? নাম এবং যশের নেশা কি এতই প্রবল? মানুষের আহার, নিদ্রা, বিলাস

পর্যন্ত হরণ করে নেয়! জগতের প্রত্যেকটী কর্ম্মবীরের জীবনই কি এই ডাক্তারেরি মতো অনাশক্ত, দ্বিধা-দ্বন্দ্বহীন? অক্লান্ত পরিশ্রমের পর যারা দু' ঘণ্টার ঘুমকে যথেষ্ট মনে করতে পারে, দেশের কাজ আর পরোপকারের জন্য যারা নিজের অমূল্য জীবনের সমস্ত সুখ স্বাচ্ছন্দকে জলাঞ্জলি দিতে পারে; নিজের প্রয়োজনের জন্য যারা পরের কাছে এতটুকুও কাকুতি মিনতি করতে জানে না,—অথচ পরের জন্য, সমগ্র জাতির জন্য, ধনীর দুয়ারে হাত পেতে ভিক্ষা মাগতেও যাদের এতটুকু অপমান বোধ হয় না; তারাই কি জগতের শ্রেষ্ঠ মানুষ? মিনার মনে একবার অনুশোচনা এলো! শেফালিকে ডাক্তারের সঙ্গে আলাপে রত দেখে মিছেমিছিই সে সন্দেহ করেছিল বলে। মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে মিনা যেন বাঁচলো এতক্ষণে!—না—না এমন করে এ সমস্ত লোকের সম্বন্ধে ভুল চিন্তা করতে নেই, এরা সাধারণ মানুষের আলাপ আলোচনার অনেক উপরে।

সহসা এক অজানা আনন্দের পূর্ণতায় মিনার চক্ষে জল ভরে উঠলো। শুধু হাসপাতাল নয়—সারা বিশ্বের প্রত্যেকটী প্রাণী তখন ঘুমে কত যে অচৈতন্য, তা বোধ করি মিনার চাইতে কেউ সেদিন আর বেশী করে উপলব্ধি করতে পারে নি!

শেষ রাত্রির দিকে সহসা কি মনে ভেবে, ডাক্তারের কক্ষে প্রবেশ করে ঘরের বাতির সুইচ-টা নিবিয়ে দিয়ে মিনা ডাক্তারের মাথার পাশের জানালাটা খুলে দিতেই, হু-হু করে এক ঝলক বাতাস এসে ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়লো।

জীবন-সংগ্রাম

অন্ধকারের ঘোর তখনো একেবারে কেটে যায় নি। রাত্রি যেন প্রভাতের দুয়ারে বিদায় নেবার জন্য মাথা কুটছে। কালো যবনিকার প্রাচীর ভেদ করে ভোর গগনের অঙ্গণে কে যেন তখন রঙের আবির মাখিয়ে দিচ্ছিল। মিনা তখন ঘুমন্ত ডাক্তারের কক্ষের জানালার পাশে দাঁড়িয়ে, অন্যমনস্কের মত গাইতে সুরু করলো—

গান

ঘুম কি মানে না মন্ না কাটেনা কি নিশি জাগি।
বসিয়া নিরালে আজি, এসোনা দুজনে থাকি ॥

আকাশে চাঁদিনী জাগিয়া একেলা,
কারে লয়ে করে অতো হাসি খেলা?—
তারি পানে চেয়ে কুহু কুহু রবে
কোকিলা উঠিছে ডাকি ॥

ক'ত কথা মোর ক'ত গান প্রিয়
শোনাবো তোমারে ওগো বরণীয়,—

তুমি রবে মোর মুখ পানে চেয়ে.
কব কথা আমি শুধু গান গেয়ে,—
হবে নিশি ভোর, তুমি রবে মোর
নয়নে স্বপন মাখি ॥

পনরো

সেদিন ভোর বেলা ঘুম ভেঙে উঠে রেবতী বাবু চা-পান করছিলেন। হঠাৎ খবরের কাগজের একটা সংবাদ বিশেষের প্রতি তাঁর নজর পড়লো। ঘটনাটা খুবই তুচ্ছ কিন্তু তবুও তার সঙ্গে যেন অনেক বেদনার আভাস জড়ানো ছিল। রেবতী বাবুর মনে পড়লো,—মানুষের পশু-প্রবৃত্তি মহাত্মা গান্ধীকেও গুলি করে হত্যা করেছে। সেখানে বাঙ্গালীকে তার ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়াটা আর তেমন বেশী মারাত্মক কি? কিন্তু রেবতীবাবু ভাবছিলেন মানুষের বর্ত্তমান রীতিনীতি এবং চরিত্রের কথা। গত ১৬ই আগষ্টের দাঙ্গাতেও বাঙ্গালী তার চরম সাহসের পরিচয় দিয়েছে। অথচ সেই বাঙ্গালীর বীর সন্তানেরা আজ কোন্ দুর্ব্বুদ্ধিতে, নিজের দেশের ভিটেমাটি ছেড়ে, যাযাবরের মতন জীবন যাপন করতে, বিদেশে, বিভূঁয়ে, বেরিয়ে পড়লো? দেড় শত বৎসরের পাশ্চাত্য কুশিক্ষার প্রভাব, জাতিকে অধার্ম্মিক এবং অর্ব্বাচিন করে তুলেছিল পূর্ব্ব থেকেই। তার ওপরে সহরের এই অতি আধুনিক সৌখীন জীবন যাপনের মোহ, মানুষকে ভীরু এবং দুর্ব্বল করে তুলেছে প্রচুর। তাছাড়া চাক্‌রীর নেশা আর উচ্চ-নীচের বৈষম্য, বাঙ্গালীকে আজ এমনি এক পর্যায়ে এনে ফেলেছে, যে, তার ভেতর থেকে, তাকে আবিষ্কার করা সত্যিই মুস্কিল হয়ে উঠেছে।

অথচ এদের সঙ্ঘশক্তিকে পুনর্জ্জীবিত করবার চেষ্টা, কেউ কর্‌ছেন বলেও তো মনে হচ্ছে না। কংগ্রেস? কারা তৈরী করে বাঁচিয়ে রেখেছিল এই কংগ্রেসকে? কারা দেশের স্বাধীনতার জন্য, দলে দলে জেলে পচে মরেছে? কারা ফাঁসীর মঞ্চে দেশের জয়গান গাইতে গাইতে হেলায় অমূল্য জীবন উৎসর্গ করেছিল? আজ বৃটিশের ভারত শাসন হস্তান্তরের মূলে কি নেতাজীর ইম্ফল অভিযানের দুর্জ্জয় প্রচেষ্টা, এতটুকুও কাজ করেনি? সেই বাঙ্গালী আজ, নিজেদের তৈরী কংগ্রেসের বাইরে দাঁড়িয়ে, কাকে বিদ্রূপ করে, নিজেদের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে, শ্বাপদ সঙ্কুলের ম'ত পথে, ঘাটে, তেপান্তরে, যাযাবরের জীবন যাপন করেছে? দেশের দাসত্ব শৃঙ্খল মোচন করতে গিয়ে সেদিনও যে বাঙ্গালী সঙ্ঘবদ্ধভাবে বৃটিশের গোলাবারুদ আর অত্যাচার হেলায় উপেক্ষা করেছে, স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়ে, সেই জাতি আজ দলাদলির কুচক্রে পড়ে, নিজেদের অস্তিত্ব নির্ম্মূল করতে উদ্ধত হয়েছে! সহসা নিজের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে রেবতীবাবু চিন্তা করতে লাগলেন। দেশের জন্য, স্বাধীনতার জন্য, তিনি নিজে বহুবার জেল খেটেছেন, বহু লাঞ্ছনা সহ্য করেছেন, কিন্তু তাতে হয়েছে কি? তিনিও তো বাঙ্গালী, কেন তিনি নতুন ভাবে কাজ সুরু করে, এদের গলদ কোথায়-দেখাবার চেষ্টা করছেন না? কেন তিনি তাঁর অগণিত কর্ম্মিদলকে পুনরায় দেশের কাজে উদ্বোধিত করে তুলছেন না? দেশের

স্বাধীনতা অর্জ্জন করা, আর লব্ধ স্বাধীনতাকে বাঁচিয়ে রাখার ভেতরে যে পার্থক্য রয়েছে, সেটা তাদের বুঝতে না দিলে, তারা কাজ ক'রবে কোন ভরসায় ? হুজুগের নেশা, জাতিকে আজ পুরোপুরিভাবে বর্জ্জন করতে হবে। স্বাধীনতা অর্জ্জনের ব্যাপারে তখন সেটার প্রয়োজন ছিল যথেষ্ট ; কিন্তু আজ দেশরক্ষার ব্যাপারে– চাই স্থির বুদ্ধি আর সুস্থ মাস্তিষ্ক !

ক্ষীরোদের মেণ্টাল হাসপাতাল আজ দাঁড়িয়ে গিয়েছে, সেটা রেবতীবাবুর একটা ভরসাস্থল। সেখান থেকে গুটি কয়েক কর্ম্মি তিনি সহজেই সংগ্রহ করে ফেলতে পারেন, তা ছাড়া পুরানো কর্ম্মিরা তো রয়েইছে। ওদিকে, সদ্য রোগমুক্ত বিলাস একখানা দৈনিক পত্র সম্পাদনার ভার গ্রহণ করে, দল নিরপেক্ষভাবে মতামত প্রচারে উদ্যোগী হয়েছে ; মুখপাত্র হিসেবে সেটাও তার অনেকখানি কাজে লাগবে। ইতিপূর্ব্বে সে সম্পর্কেও রেবতীবাবুর, বিলাসের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হয়েছে। অতএব এর পর তো আর নতুন উদ্যম নিয়ে, দেশের শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে অগ্রসর হতে না পারার কোনও কারণই থাকতে পারে না রেবতীবাবুর ?

রেবতীবাবু উঠে দাঁড়ালেন। কাজ তাঁকে আজ থেকেই সুরু করতে হবে। ঘরে পায়চারী করতে করতে তিনি ভাবতে লাগলেন,– কি ভাবে কাজ সুরু করা যায় ! সহসা দেয়াল ঘড়ির দিকে নজর পড়তেই তিনি দেখলেন, আট টা বাজতে আর মাত্র পনরো মিনিট বাকী। হাসপাতালের বার্ষিক উৎসবে আজ

তাঁকে যোগ দিতে হবে। তাঁর মনে পড়লো, ঠিক সাড়ে আট-টাতেই সভাপতি মিঃ বাসুর আসরে অবতীর্ণ হবার কথা। তিনি স্নানের সরঞ্জাম নিয়ে বাথরুমের দিকে যাত্রা করলেন।

* * * *

'সরোজ সেবা সদনের' বিরাট প্রাঙ্গণে, হাসপাতালের আজ দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে! উৎসব প্রাঙ্গণের পশ্চাতে সুপ্রসস্থ বিভিন্ন হাসপাতাল বাড়ীর দোতলা এবং তেতলার গাড়ীবারান্দায়, কর্ম্মে রত, ব্যস্ত ডাক্তার, ছাত্র, এবং নার্সেরা, চলার পথে সহসা থেমে থেমে, দাঁড়িয়ে তাই দেখে যাচ্ছিল। উৎসব প্রাঙ্গণের দক্ষিণে ছিল ইমার্জ্জেন্সী ডিপার্টমেণ্টের বিরাট সেডযুক্ত একটা চত্বর; সেখানে সারিবদ্ধ ভাবে কয়েকখানি এম্বুলেন্স দাঁড়িয়েছিল। আর বামে ছিল হাসপাতালের আউট-ডোর ডিপার্টমেণ্ট। রোগীরা যার যার মত ঔষধ নিয়ে, ছেলে মেয়ের হাত ধরাধরি করে সেখান থেকে পর পর বেরিয়ে আসছিল। হাসপাতালের গেটের দু' পাশের বড় রাস্তায়, নানা ধরণের মোটর, ঘোড়-গাড়ী এবং ট্যাক্সি অপেক্ষা করছিল।

সভাপতি মিঃ বাসুর মোটর গেটের মুখে আবির্ভাব হতেই, ব্যাজ পরিহিত ব্যণ্ডবাদ্যধারী একদল ছাত্র, 'বন্দে মাতারম' এবং 'জয়-হিন্দ' শব্দে, ভারতীয় কায়দায় অভিনন্দন জানিয়ে তাঁকে গাড়ী থেকে নামালো। সভাস্থ ব্যবস্থাপক মণ্ডলী তখন বিপুল 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনির ভেতরে—রকমারী টাট্‌কা ফুলের এক

বিরাট মালা, মিঃ বাসুর গলায় পরিয়ে, তাঁকে তাঁর সুনির্দ্দিষ্ট আসনের সম্মুখে নিয়ে উপস্থিত করলেন। মিঃ বাসু আসনে উপবেশন করবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যণ্ডবাদ্যধারী কর্ম্মিদল, কাড়া নাকারা সংযোগে বাণ্ড্ বাজিয়ে গাইতে সুরু করলো—

গান।

চল্‌রে চল্—চল্—চল্, কাজের পথেই এগিয়ে চল্।
কি পেলি আর কি পেলি না—হিসেবে তার কাজ কি বল্॥
(চলরে—চল্—চল্—চল্)

বিশ্বে চলার মানুষ যারা
পেছন ফিরে চায়না তারা,
বিপদ্ বাধা আসুক না ভাই—
থাকবো মোরা অবিচল॥
(চলরে—চল্—চল্—চল্)

মোদের নবীন জীবনে রবে না—
ক্লান্তি, হিংসা, লেশ;
দুর্ব্বার গতি চলিব আমরা—
দলিয়া সকল ক্লেশ;—

কাজের যে আছো এসো যোয়ান্
স্বার্থক করো—এ—অভিযান;—
স্বাধীন ভারতে গড়িব আমরা—
শৌর্য্য, শান্তি, স্বাস্থ্য, বল্॥
(চলরে—চল্—চল্—চল্)

গানখানি শেষ হয়ে যেতেই মিঃ বাসু উঠে দাঁড়িয়ে জনতাকে অভিনন্দন জানিয়ে, সুরু করলেন—

"আমার দেশের প্রিয় ভ্রাতা ভগ্নীগণ—আজ আপনাদের এই

উৎসবে এসে আমি এক নূতন প্রেরণার আভাস পেলুম। কর্ম্মিদলের এই সুমহান সঙ্গীতের ভেতর দিয়ে, হাসপাতালের উৎসব উপলক্ষে, আপনারা আজ দেশের আপামর-জনসাধারণের মনে যে সুপ্রতিষ্ঠার ছাপ এঁকে দেবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছেন, তাতে জাতি উদ্বোধিত হবে। স্বাধীনতার দ্বার প্রান্তে এসে, নানা সমস্যায় জর্জ্জরিত, কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় নগরবাসী আমরা, আজ যে ভাবে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছি, তাতে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে শুধু নুতন প্রেরণার। কিন্তু সেই প্রেরণার উৎস আজ যদি আমরা সর্ব্বান্তকরণে আমাদের দেশের অগণিত যুবক এবং ছাত্র-ছাত্রিদলের তরফ থেকে আন্তরিক ভাবে না পাই ;—তা হলে দুঃখ্যু রাখবার আর আমাদের জায়গা থাকবে না। যুগে-যুগে, সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালে স্বাধীনতা রক্ষা করে এসেছে সেই দেশেরই অগণিত সুশিক্ষিত যুবক যুবতী বৃন্দ। আমাদের প্রবীন অভিজ্ঞতা, সুষ্ঠু কর্ম্ম পরিচালনার পক্ষে, ক্রমশঃ স্থবিরত্ব প্রাপ্ত হয়ে আসছে। আজ তাই আমাদের বিপুল কর্ম্মভার, দেশের যুবক-যুবতী-বৃন্দের হস্তেই ন্যস্ত করে নিশ্চিন্ত হতে চাই। আজ আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে স্থিরবুদ্ধি-সম্পন্ন-সুশিক্ষিত কর্ম্মির,—যাঁরা বিপদ্ বাধাকে তুচ্ছ করে, দেশকে তাঁদের সুচিন্তিত কর্ম্মের ভেতর দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। সর্ব্বান্তঃকরণে আজ আমি বিশ্বনিয়ন্তার চরণে প্রার্থনা করছি, আপনাদের সেই প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হোক। জয় হিন্দ।"

তারপর ডাক্তার ক্ষীরোদ চৌধুরীর মুখে হাসপাতালের

বার্ষিক কার্য্যবিবরণীর বিবৃতি—শুনে, অসংখ্য ধন্যবাদ দিতে দিতে মিঃ বাসু সভাস্থ ভদ্রমণ্ডলীর কাছে বিদায় গ্রহণ করে, নিজের মোটরে উঠে হাসপাতালের প্রাঙ্গণ পরিত্যাগ করলেন।

মিঃ বাসুর মোটর গেটের বাইরে বেরিয়ে যাবার পর দেখা গেল—একখানি রোজরয়েস্ মোটরে করে রেবতীবাবু,—সরোজ রায় চৌধুরী ও লতিকা দেবীকে নিয়ে, বক্তৃতা মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসছেন।

বিভিন্ন আসনে উপবিষ্ট, ধীরেনবাবু, বিলাস, মাধবী দেবী, সকলেই সরোজ রায় চৌধুরীর এই আকস্মিক আবির্ভাবে মনে মনে রেবতীবাবুকেই এর উদ্যোক্তা মনে করে, পরস্পর পরস্পরের প্রতি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মুখ চাওয়া-চাওই করতে লাগলেন।

কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় ক্ষীরোদ ডাক্তার তখন সহসা তার বক্তৃতা বন্ধ করে, অনিচ্ছা সত্ত্বেই বক্তৃতা মঞ্চ থেকে নেমে আগন্তুক দিগের সম্বর্দ্ধনার জন্য মোটরের দিকে পা বাড়ালো। কিন্তু তার পূর্ব্বেই ধীরেনবাবু, মিনা আর শেফালি, মোটরের পাশে উপস্থিত হয়ে, তাঁদের সসম্মানে বক্তৃতা মঞ্চের পাশে এনে তিন খানি চেয়ারের ব্যবস্থা করে দিলেন। ক্ষীরোদ ডাক্তার তখন উৎসব-কর্ম্ম-সুচীর অবশিষ্ট কাজটুকু সুসম্পন্ন করার জন্য রেবতীবাবুকে অনুরোধ করলো!

অজানিত, আকস্মিক এই উৎসব প্রাঙ্গণে অনাহুতের মত উপস্থিত হয়ে, একদিকে সরোজ রায় চৌধুরী এবং লতিকা দেবী যেমনি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন, অন্যদিকে তেমনি মাধবী

দেবী, সুপ্রিয়া এবং ক্ষীরোদ ডাক্তারও সহসা কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়লো। সরোজ সেবা সদনের নাম শুনে, মাধবীর মনে গোড়া থেকেই কেমন যেন একটা খট্‌কা লেগেই ছিল; কিন্তু স্বামীর চিকিৎসার ভেতর দিয়েও সে ইতিপূর্ব্বে কোনদিনই তার নিজের ভাই ক্ষীরোদ ডাক্তারের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পায়নি। পাশাপাশি আজ এই বিরাট জনমণ্ডলীর ভেতরে, পিতা, মাতা এবং ভ্রাতাকে চাক্ষুষ দেখতে পেয়ে, সহসা মাধবীর মাথাটা যে'ন কেমন ক'রে উঠতেই হাত ইসারায় মিনাকে ডেকে সে তাকে স্থানান্তরে নিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ করলো। মিনা তখন তাকে উৎসবের আসন থেকে উঠিয়ে নিয়ে, হাসপাতালের ওয়েটীং রুমে রেখে এলো।

সুপ্রিয়া ভাবছিল অতীত জীবনের কথা। মিনার দাদা এক ধীরেনবাবুর কথা সুপ্রিয়া ইতিপূর্ব্বেই শুনেছিল। অথচ এখানে কে এই লোকটা? অবিকল যেন কলেজ লাইফের সেই ব্যক্তিটি?...

বিলাস অন্য সব তেমন লক্ষও করেনি। সে তখন ভাবছিল তার ফেলে আসা জীবনের বিপর্য্যস্ত দিনগুলির কথা। শ্বশুর শাশুড়ী এবং শ্যালক ক্ষীরোদকে সে ইতিপূর্ব্বেই চিনতে পেরেছিল, কিন্তু সে-জন্য তাদের সঙ্গে সহসা পরিচিত হবার আকাঙ্ক্ষা তার এতটুকুও ছিল না। তার মুখের চেহারা দেখে, লজ্জায় কিম্বা অভিমানে যে তটস্থ হয়ে উঠেছে সে তেমনও কিছু কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল না। যেখানে ছিল, সেইখানেই সে

তেমনি নির্ব্বিকার চিত্তে বসে, রেবতীবাবুর কর্ম্মতৎপরতা চেয়ে দেখছিল। অরুণ, মাঝে মাঝে এক একবার বিলাসের কাছে ছুটে গিয়ে, নবাগত ব্যক্তিবর্গের পরিচয় তার কাছে জেনে নিয়ে, উৎফুল্ল মনে, হ্যাট কোট প্যাণ্ট্ পরিহিত ছোট্ট দেহ দুলিয়ে ইতস্ততঃ বিচরণ করে বেড়াচ্ছিল। অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হলে, সে কখনো বা গলার রুমালটাকে খুলে নতুন করে বেঁধে নিচ্ছিল; কখনো বা মিনার কাছে ছুটে গিয়ে, এটা, ওঠা, সেটা, জানবার জন্য তাকে প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত করে তুলছিল।

ওদিকে, রেবতীবাবুকে আজ সত্যিই ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল। শুভ্র খদ্দরের পোষাকে অচ্ছাদিত বলিষ্ঠ সুগঠিত দেহে, সৌম্যদৃষ্টি নিয়ে, তিনি যখন ক্ষীরোদের দেওয়া কর্ম্মসূচী হাতে করে, সভাপতির আসনের পাশে গিয়ে অগণিত উৎসুক জনতার দিকে তাকালেন, তখন তার বক্তৃতা শোনবার জন্য সমবেত জনতা তাঁকে মুহুর্মূহু 'জয়হিন্দ' এবং 'বন্দেমাতরম', ধ্বনিতে আপ্যায়িত করতে লাগলো। করজোড়ে তাঁদের সেই অভিনন্দন গ্রহণ করে, জনতাকে বসবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে রেবতীবাবু সুরু করলেন,—

"এই বাৎসরিক উৎসবে যোগদানে, আমার বিলম্ব হওয়ার জন্য, মিঃ বাসুকে এটেন্ড্ করতে পারি নি। সেজন্য প্রথমেই আমি আপনাদের কাছে মার্জ্জনা চাইছি। কিন্তু এই বিলম্বের জন্য আজ আমি যাঁদের এই উৎসবে এনে হাজির করতে

পেরেছি, তাঁদেরি কৃপায় আজ আপনারা ডাক্তার ক্ষীরোদ চৌধুরীর মত ব্যক্তিকে পেয়েছেন।”

তারপর একে একে, সরোজ রায় চৌধুরী, ধীরেন বাবু এবং ক্ষীরোদ ডাক্তারের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করে, তিনি বোলতে শুরু করলেন,—“সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত সরোজ রায় চৌধুরী যিনি আমার দক্ষিণে সস্ত্রীক বসে রয়েছেন, এঁরই নামানুসারে এই হাসপাতালের নামাকরণ করা হয়েছে—‘সরোজ সেবা সদন,’—ডাক্তার ক্ষীরোদ রায় চৌধুরী হচ্ছেন এঁরই সুযোগ্য পুত্র। কিন্তু এই হাসপাতালটি যাঁরা প্রচুর অর্থ এবং আসবাব পত্র দিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করে তোলবার কাজে সাহায্য করেছেন, তাঁদের উদ্যোক্তা হচ্ছেন, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নারায়ণ রায়, যিনি আমার এই পার্শ্বের আসনে সমাসীন রয়েছেন।” নাম উচ্চারণ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সরোজ রায় চৌধুরী এবং ধীরেন বাবু, উঠে দাঁড়িয়ে জনতাকে অভিনন্দন জানিয়ে, আবার নিজ নিজ আসনে উপবেশন করলেন। রেবতীবাবু বলে চললেন,—

“এইখানেই আমার বক্তব্যের শেষ নয়। ‘সরোজ সেবা সদন’ যদিও গুটীকয়েক অক্লান্ত কর্ম্মির নিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ পেয়েছে, কিন্তু তবুও সর্ব্বোতভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার কাজ এখনো এর নিষ্পন্ন হয় নি। তবে আশা আছে, প্রাথমিক কাজ যখন নানা বাধা বিপত্তির ভেতর দিয়েও সম্পন্ন হতে পেরেছে, তখন বাকী কাজ একদিন এর নিশ্চয়ই সুসম্পন্ন

হবে।" এমনি সময়ে লতিকা দেবী, রেবতীবাবুর সম্মুখে সহসা এগিয়ে গিয়ে কি যেন তাঁর কানে কানে বলেই আবার নিজের চেয়ারে গিয়ে উপবেশন করলেন। রেবতীবাবু তাঁর থামানো কথার সূত্র ধরে পুনরায় বলতে শুরু করলেন,—

"কিন্তু এই একটা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠাই আজ আমাদের সব নয়! দেশের এই নবলব্ধ স্বাধীনতাকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপরে সুপ্রতিষ্ঠিত করে তুলতে হলে, 'সরোজ সেবা সদনের' মত আরো হাসপাতাল ছাড়াও—আজ চাই আমাদের প্রচুর বিদ্যালয় এবং শিক্ষাকেন্দ্র। যেখান থেকে দেশের লক্ষ লক্ষ ছাত্র ছাত্রী যন্ত্রবিদ্যা এবং শিল্পকলায় সুশিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে! আমাদের মনে রাখতে হবে, এ দেশের ধনশালী ব্যক্তিরা, আমাদের কোন নবীন প্রচেষ্টাকেই গোড়ায় সমর্থন করবেন না। তার কারণ, আমাদের কর্ম্মশক্তিতে তাঁদের আস্থা নেই। কিন্তু যদি তাঁরা দেখতে পান, অনেক পরিশ্রম করে, অনেক খেটে খুটে, কোনও রকমে আমরা একটা কিছু খাড়া করেছি; তখন তাঁরা অন্ততঃ নাম কেনবার মোহেও, আমাদের কিছু কিছু সাহায্য করেন। যেমন ধরুন একটা উদাহরণ দিচ্ছি এই হাসপাতালের ব্যাপার নিয়ে। মিসেস্ রায় চৌধুরী একটু পূর্ব্বেই আমাকে সরোজ সেবাসদনের ফণ্ডে তিন লক্ষ টাকা দান করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অথচ গোড়ায় যদি আমরা তাঁর কাছে গিয়ে, মাত্র পাঁচটী টাকাও সাহায্য চাইতাম, তা হলে কিন্তু তিনি পাঁচটী পয়সা দিয়েও তখন আমাদের সাহায্য

করতেন না! কথাটা অপ্রিয় সত্য, এবং সে জন্য মিসেস্ চৌধুরীর কাছে, আপনাদের সমক্ষেই আমি মাপ চাইছি। আসলে, এমনিই রক্ষণশীল মনোবৃত্তি হচ্ছে দেশের ধনীক সম্প্রদায়ের। কাজেই দেশকে সর্ব্বোতভাবে গড়ে তোলবার ব্যাপারে, আমরা যদি নিঃস্বার্থভাবে কর্ম্মে গা ভাসিয়ে দিতে না পারি, তা হলে আমাদের এই স্বাধীন দেশের অগ্রগতি, অন্ধ ভবিষ্যতের মতোই অন্ধকারে ডুবে থাকবে। ধনীকের ব্যাঙ্কের গচ্ছিত অর্থ,—অথবা তাঁদের সিন্ধুকে রক্ষিত টাকার স্বপ্ন চিন্তায়, দেশের লোকের উপকার কোনদেশেই হয়নি। অতএব আমাদেরও তা হবে না। অর্থের চাইতেও প্রচুর প্রয়োজন হচ্ছে আজ এ দেশে নিরপেক্ষ কর্ম্মির! দেশের অগণিত সুশিক্ষিত ছাত্রছাত্রীরাই হচ্ছেন সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালের শ্রেষ্ঠ কর্ম্মি। সংগঠনের কাজে, তাঁরা যদি আজ ন্যায় নিষ্ঠভাবে অগ্রসর হয়ে গঠনমূলক কর্ম্মের প্রস্তাব, প্রতিবেশীর চক্ষুর সম্মুখে মেলে ধরতে পারেন, তাহলে উপকরণ—অর্থাৎ, অর্থের অভাবে তাঁদের কাজ নিশ্চয়ই পড়ে থাকবে না। আমরা তখন দেখতে পাবো, বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে, আমাদের দেশ-ও অন্য পাঁচটা স্বাধীন দেশের মতই—শিক্ষায়, দিক্ষায়, শৌর্য্যে, সাফল্যে, সুসমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। আপনারা কি বলতে পারেন—সেদিন আর আমাদের কতদূরে?" রেবতী বাবুর প্রশ্নের উত্তরে, সভাস্থ ছাত্রছাত্রীরা সমবেত কণ্ঠে তৎক্ষণাৎ বলে উঠলো—"বেশীদূরে নয়—আর বেশী দূরে নয়"। রেবতীবাবু

বললেন—"আপনাদের আমি আমার স্বশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাচ্ছি! 'জয়হিন্দ'!"

তারপর কর্ম্মিদলের 'বন্দেমাতরম' ধ্বনির ভেতরে সভা ভঙ্গ হলো।

ষোল

উৎসব শেষে, ভারাক্রান্ত মনে, সরোজ রায় চৌধুরী তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে যখন মোটরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন,—তখন লতিকাদেবী দেখতে পেলেন, পূর্ব্ব থেকেই একটী ছয়-সাত বৎসরের বালক, তাঁদের মোটরের পা দানিতে দাঁড়িয়ে ড্রাইভারের সঙ্গে যেন কি সব কথা বোলছে। গোড়া থেকেই লতিকাদেবী লক্ষ করেছিলেন, এই ছেলেটি নিজের পরিপূর্ণ উৎসাহে উচ্ছ্বসিত হয়ে, ইতিপূর্ব্বে সভাস্থ বহু নরনারীর আনন্দের খোরাক জুগিয়েছে। এক সময়ে তাঁর মনে হয়েছিল ঠিক যেন বিলাসের মতো একটী লোকের কাছে ছেলেটি বার-কয়েক যাতায়াত করেছে। উৎসব শেষে তিনি কিন্তু আর সে লোকটিকে সেই চেয়ারে দেখতে পাননি! সেই ছেলেটিই কি তাঁদের মোটরের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলছে?

দ্রুতপদে লতিকাদেবী মোটরের কাছে এগিয়ে গেলেন। ছেলেটির দিকে হেসে তাকাতেই সে বলে উঠলো,—"এটা

বুঝি তোমাদের মোটর ?” কথা শুনে, লতিকা দেবী বালকটিকে জড়িয়ে ধরে, গালে চুমো খেতে খেতে বললেন,—“চড়বে তুমি এই মোটর গাড়ীতে ? এসো দরজা খুলে দিচ্ছি।”

ড্রাইভারের হস্তক্ষেপে সহসা মোটরের দরজাটা খুলে গেল।—আর তক্ষুনি, ছেলেটি গিয়ে মোটরের গদি আটা বিরাট তুলতুলে সিটের ভেতরে বসেই যেন একেবারে ডুবে গিয়ে, প্রাণপণে উঠে বসবার জন্য চেষ্টা করতে লাগলো। লতিকা দেবী তখন ভেতরে প্রবেশ করে, তাকে কোলে টেনে তুলে, পাশের শক্ত একটা জায়গায় বসিয়ে দিয়ে বললেন—“তুমি বুঝি আর কক্ষনো মোটরে চড়নি ?”

ছেলেটি বললো,—“তা কে'ন ? আমার মিনা পিসিদের তো একটা মোটর রয়েছে ; তাতে কতদিন চড়েছি। সেটা খুব ভালো. মোটর ! তোমাদের এ মোটর-টা এমন গর্ত্ত হয়ে যায় কে'ন ? গাড়ীর তলায় তোমরা কোনদিন পড়ে যাও যদি তখন কি হবে ?”

হাস্‌তে হাস্‌তে লতিকা দেবী বলেন,—“তা পড়তে যাবো কেন ? এটা দামী মোটর কিনা, তাই সব বসবার জায়গাগুলো খুব নরম ! তুমি ছোট্ট মানুষ যে—তাই তো ডুবে গিয়েছিলে ! কিন্তু এখন কেমন সুন্দর জায়গায় বসিয়েছি ? তোমার পিসিদের মোটর তো এটার চাইতে ঢের ছোট্ট ! তাই নয় কি ?”

রেবতী বাবুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে সরোজ রায়, মোটরের সামনে এসে, সোনায় বাঁধানো বেতের লাঠিটায় বাঁ হাতে

ভর দিয়ে, ডান হাতে মোটরের দরজার খোলা হাতলটা টেনেই—বিস্ফারিত নেত্রে লতিকা দেবীকে প্রশ্ন করলেন,—"কে এই ছেলেটি লতু ?" জবাবের সঠিক উত্তর এড়িয়ে গিয়ে, লতিকা বললেন,—"খোকাকে আমাদের এই মোটর গাড়ীটা দিলে, ও নাকি আমাদের বাড়ী গিয়ে অনেকদিন থাকবে। সেইজন্যই ওকে আমি গাড়ীতে চড়িয়েছি।"

মোটরের ভেতরে প্রবেশ করতে করতে, সরোজবাবু ড্রাইভারকে হুকুম করলেন, দরজা খুলে দিয়ে রেবতীবাবুকে তার পাশে বসিয়ে নিতে! আর ছেলেটির দিকে চেয়ে হেসে বোললেন,—"তোমার নামটি কি ভাই ?"

সরোজবাবুর দিকে, বিস্মিত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে খোকা ব'লে উঠলো,—"শ্রীঅরুণকুমার রায়। কিন্তু তুমি দেখছি কিচ্ছুই জান-না ? আমার মতো ছোট্ট ছেলে আবার তোমার ভাই হ'তে যাবে কে'ন ?" লতিকা দেবী তাড়াতাড়ি খোকার কানের কাছে মুখটা নিয়ে, ব'লে উঠলেন,—"তা তুমি জানোনা বুঝি ? তোমার বাবাই তো হচ্ছেন ঐ বুড়োটারো বাবা! আর আমরা দু'জনেই হচ্ছি তোমার মায়ের বুড়ো ছেলেমেয়ে। আমরা যখন তোমার মায়ের পেটে হয়েছি, তখন তো তুমি পৃথিবীতেই আসোনি, তবে জানবে কি করে—বুড়োটা তোমার ভাই হয় কিনা ?"

"মুচকি হেসে, ছেলেটি গম্ভীরভাবে উত্তর দেয়, "আমাকে ছেলে মানুষ পেয়ে কি যে সব তোমরা বোলছো, তার আর

ঠিক নেই। আমার মায়ের তো মাথার চুলই পাকেনি! তা তোমাদের মতন বুড়ো হাবড়া ছেলে মেয়ে তার পেটে হতে যাবে কেন?"

চলন্ত গাড়ীর সামনের সিটে বসে, পেছন ফিরে তাকিয়ে, রেবতী বাবু ছেলেটিকে বললেন,—"ওঁরা তোমার দাদা মশাই আর দিদিমা হ'ন অরুণ! মায়ের মুখে গল্প শোননি? ওদের বাড়ীতে যে তুমি যাচ্ছ?—তা তোমার মাকে বলে এসেছ তো?"

রেবতীবাবুর কথা শুনে, মুখ কাঁচুমাচু করে অরুণ বলে উঠলো, "বারে! মা-যে তখন কোথায় চলে গিয়েছিল, কি করে তা হলে আমি গিয়ে মাকে বলে আসবো সে কথা?" খোকার মুখের দিকে দেখে নিয়ে লতিকা দেবী বললেন,— ওঁর কথা শুনে "কেন ভয় পাচ্ছ তুমি?—তোমার মা যখন শুনবে, তুমি আমার কাছে রয়েছ, তখন সে কিচ্ছু বোলবে না কোনদিন তোমাকে!" আশ্বস্থ অরুণ, লতিকা দেবীর মুখের দিকে চেয়ে তখন হাসিমুখে বললো,—"তা তুমি কেমন করে জানলে?"

"বা-রে! তোমার মা যে আমার পেটে হয়েছে! সে যেমন তোমার মা-না? আমিও ত তেমনি তোমার মায়ের মা হই যে! আমার কাছে থাকলে—বলতে পারে কোনদিন তোমার মা তোমাকে কিছু? তোমার দেখছি কিচ্ছু বুদ্ধি নেই। লেখাপড়া কর না বুঝি?"

চোখ পাকিয়ে অভিমানের ভঙ্গীতে অরুণ লতিকা দেবীর কথার উত্তরে বললে—"না লেখাপড়া করিনে,—তোমাকে বলেছে! চল-ই না আগে তোমাদের বাড়ীটা দেখে নি, তারপর

যখন আমি রবিঠাকুর আর কাজী নজরুলের কবিতা তোমাকে শুনিয়ে দেবো, তখন বুঝতে পারবে আমি কতো লেখাপড়া জানি!" তারপর অন্যমনস্কের মতো, কিছুক্ষণ কি যেন ভেবে নিয়ে অরুণ বললো,—"একবার চল-ই না তবে আমাদের বাড়ীতে, মাকে আমি বলে আসি? নইলে মা যদি রাগ করে?"

—"তা করবে কে'ন? তোমার পিসিদের কি টেলিফোন নেই? আমাদের বাড়ী থেকে তোমার পিসিকে টেলিফোনে বলে দিলেই তো তোমার মা জানতে পারবে তুমি আমার কাছে রয়েছ! কেমন তা'হলেই হবে না?" নিশ্চিন্ত হওয়ার ভাবে উৎফুল্ল হয়ে, লতিকা দেবীর কোলে উঠে বস্তে বস্তে, বুদ্ধিমানের মতো মাথা নেড়ে অরুণ বলে.—"তা হলেই ঠিক হবে! তোমাদের বাড়ীতেও একটা টেলিফোন আছে বুঝি?"

—"শুধু কি টেলিফোন?—আরো কত কিছু রয়েছে, চল-ই না। সে সব দেখলে তোমার আর ফিরে আসতেই ইচ্ছে হবে না। তখন তোমার মা আর বাবাকে শুদ্ধু আমাদের বাড়ীতে নিয়ে আসতে ইচ্ছে করবে!"

কথার উত্তর দিতে ভুলে গিয়ে, অরুণ তখন দেখছিল, মোটর-টা গিয়ে বিরাট একটা রেলিং ঘেরা ফুল বাগানের ভেতরের রাঙ্গা মাটির পথ দিয়ে, প্রকাণ্ড একটা বাড়ীর গাড়ী-বারান্দার তলায় থেমে দাঁড়ালো! গাড়ী থেকে নেমে বাগানের ফুল গুলোর দিকে নজর পড়তেই, অরুণ একটা রেলিংএর দরজা ঠেলে, সেই বাগানের ভেতর ঢুকে দেখলো, দুটো লাল-নীল

পাখী, ঘাসের ভেতর থেকে, কি যেন সব ঠোঁট দিয়ে খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। আর তার একটু দূরেই দেখলো, একজন বুড়ো লম্বাটে কালো মানুষ, খালি গায়ে, এক একটা গাছের গোড়ায়, ঝাঁঝরিতে করে জল দিচ্ছে! রাঙ্গা মাটীর সরু পথ দিয়ে, আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়ে অরুণ দেখলো,—একটা বড় চৌবাচ্চার জলে, দুটো বড় বড় রাজহাঁস সাঁতার কাটছে! তাদের গায়ের সাদা পালক আর হল্‌দে ঠোঁট দেখে, হাঁস ধরবার জন্য যেই সে সামনে এগিয়ে গেল, আর অমনি—বড় হাঁস-টা তার লম্বা গলা বাড়িয়ে ছুটে আসতে লাগলো অরুণের দিকে! তাই দেখে অরুণ ভয়ে চিৎকার করে উঠলো—! তার চিৎকার শুনে, সর্ব্বাগ্রে ছুটে এলো মালী, আর তার পেছনে পেছনে ছুটে এলেন লতিকা দেবী! তাড়াতাড়ি অরুণ তখন দিদিমায়ের পেছনে লুকিয়ে, হাঁসটাকে উঁকিমেরে দেখেই বললো, "বাব্বা! কি ঠোঁট আর লম্বা গলা! ওগুলো কেন রেখেছ? কামড়ে গা থেকে মাংস তুলে নেবে যে!" লতিকা দেবী তখন হাঁসটাকে জাপটে ধরে, সোহাগ করতে করতে বললেন,—"কৈ কামড়াচ্ছে? তোমায় নতুন দেখেছে কি না? তাতেই তোমাকে ভয় দেখাচ্ছিল! ওরা কক্ষনো কাউকে কামড়ায় না। চল বাড়ীর ভেতরে সেখানে আরো কতো কি রয়েছে দেখবে চল!"

সামনের বড় হল-ঘরটার ভেতরে ঢুকে অরুণ একেবারে হক্‌চকিয়ে গেল। কতো বড় বড় সব দেয়াল ছবি! কী সুন্দর

বিরাট ঘড়িটার লেজের সঙ্গে ছোট্ট একটা মেয়ে ঘাঁগড়া উড়িয়ে, এধার থেকে ওধারে দোল খাচ্ছে যেন! কত রকমের পুতুল ভর্ত্তি সব কাঁচের আলমারী! কতবড়ো আয়নাটা ঐ ড্রেসিং টেবিলে লাগানো রয়েছে? মিনা পিসিদের-টা ও রকমই নয়!

—"তুমি দাঁড়িয়ে পড়লে কেন?—আমার সঙ্গে এসো একটু এগিয়ে, কতবড়ো কাকাতুয়া দেখবে এসো।"—বলেই লতিকা দেবী সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। সহসা রেবতী বাবুর হাসির শব্দ ভেসে এলো—সেই হল ঘরটার একপাশ থেকে। অরুণ চেয়ে দেখলো কেমন সুন্দর চক্‌চকে দুটো বড় বড় কৌচের ভেতরে বসে, তার দাদু আর রেবতীজ্যেঠা, কি যেন সব বলাবলি করছে! তারপর কি ভেবে সামনের দিকে একটু এগিয়েই অরুণ দেখলো,—পাশেই একটা মস্তবড় দরজা। কী মোটা কাঠের পুরু পাল্লা তাতে! কোথায় গিয়ে যে মিশেছে তার ঠিক নেই! ওপরের দিকে চাইলেই যেন ঘাড়টা টাটিয়ে ওঠে! খোলা দরজাটার মাঝামাঝি গিয়ে অরুণ দেখলো,—ও পাশের মস্ত শ্বেত পাথরের বারান্দার এক পাশে, লোহার রডের ওপর পাশাপাশি মাথায় ঝুঁটিওয়ালা দু'টো বড় বড় পাখী বসে রয়েছে! ঐ গুলোই বুঝি কাকাতুয়া? কথাটা ভালো করে জেনে নেবার জন্য, অরুণ উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে আশে পাশে তার দিদিমাকে খুঁজতে লাগলো।

পাশের বারান্দা পেরিয়ে, কে একজন থান কাপড় পরা মেয়েছেলে, সেই দিকের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে যাচ্ছিল; দেখেই

তাকে অরুণ ডেকে বললো,—"ওঁকে একবারটি ডেকে দাও না তুমি!" মেয়েছেলেটি অরুণের দিকে চেয়ে একটু হেসে, ঘাড় নেড়ে ওপরে চলে গেল! সে চলে যেতেই, অরুণ আশ্চর্য্য হয়ে দেখলো,—একখানা লাল টুকটুকে রেকাবি ভরতি, কি সব নিয়ে যে'ন ওপর থেকে তার দিদিমা তার দিকেই এগিয়ে আসচেন। অরুণ তাঁকে দেখেই খুশীতে উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠলো,—"বাঃ—রে! তোমায় কতো খুঁজছিলুম যে?"

—"খিদে পায় নি বুঝি তোমার! তাই তো গিয়েছিলুম! নাও এইগুলো একবার চট্‌পট খেয়ে নাও দেখি, নাইতে হবে না? কতো বেলা হোল, ভাত খেতে হবে যে!" এই বলে তিনি ছোট্ট রেকাবি-টা অরুণের হাতে ধরে দিয়ে, আবার বললেন,—"চল, ওপরে বসে বসে খাবে চলো!"

রেকাবি ভরতি চকোলেট, ডিম সন্দেশ, আর বড় একটা কমলালেবু দেখে, পাখীর কথা জিজ্ঞেস করতে অরুণ বেমালুম ভুলে গিয়ে, লতিকা দেবীর সঙ্গে, আস্তে আস্তে উপরে উঠতে লাগলো!

দোতলার ঘরের আসবাব পত্র আর দেয়ালের সব বড় বড় অয়েল পেইনটিংয়ের ফটো দেখে, অরুণের মাথা একেবারেই গুলিয়ে গেল! এ কোথায় এসেছে সে? এত বড়লোক এরা! অথচ বল্‌ছে কে'ন এটা নাকি অরুণের দাদুর বাড়ী? ঐ বুড়োটাই তো অরুণের দাদু—গাড়ীতে দিদিমায়ের পাশে বসে এলো যে? এই দিদিমা-টা নাকি তারি মায়ের মা

হয়? কিন্তু মা তবে তাকে নিয়ে একদিনও এখানে আসেনি কেন?

মস্তবড় একটা ছাপর খাটে পা তুলিয়ে, অরুণকে পাশে বসিয়ে অনেকক্ষণ নাতির দিকে চেয়ে থেকে, লতিকা দেবী একসময়ে বললেন,—"বাঃ-রে! তুমি খাচ্ছ না কেন?" সে কথার উত্তর না দিয়ে অরুণ বলে,—"আচ্ছা তুমি যদি আমার দিদিমা?—তবে আমার মাকে নিয়ে এলে না কেন?"

বালকের কথায় লতিকা দেবী রীতিমতো মুস্কিলে পড়লেন, কিন্তু মুখে বললেন,—"তোমার বাবা যে আসতে সময় পায় না কিনা? তাইতো তোমার মা আসে না! ঐ তো তোমার মা আমার ঘরেই রয়েছে!" বলেই লতিকা দেবী একটা বড় অয়েল পেইনটিংয়ের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করলেন। অরুণ তৎক্ষণাৎ সেই ফটো-টার সামনে ছুটে গিয়ে দেখলো, সত্যিই তো তার মা! বোগলে ক'খানা বই নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে? এগিয়ে গিয়ে লতিকা দেবী তখন ক্ষীরোদ ডাক্তারের ফটো-টা দেখিয়ে বললেন,—"এঁকে চেনো? ইনি তোমার মামা হন!" দিদিমার কথায় উৎফুল্ল হয়ে অরুণ বলে উঠলো,—"হাসপাতালের সেই বড় ডাক্তার বুঝি? ভারি আশ্চয্যি তো? আমার মামা হবে কেন দিদিমা?"

—"তোমার মায়ের আপন ছোটভাই যে! কথা বলেছো তুমি ওর সঙ্গে?"

—"না—তো! বাবার যখন অসুখ ছিল, আমি মিনা পিসির

সঙ্গে বাবাকে দেখতে হাসপাতালে যেতুম! এই ডাক্তার বাবাকে রোজ এসে দেখতো! আমাকে অনেকদিন বলেছে, খোকা তোমার নাম কি? তোমাদের বাড়ী নিয়ে যাবে আমাকে? আমি কিছু বলিনি! আমার মিনা পিসিও ঐ ডাক্তারকে খুব ভালোবাসে! মাকে ওঁর সম্বন্ধে কত কথা বলে! হ্যাঁ দিদিমা উনি নাকি খুব বড় ডাক্তার?"

অন্যদিকে মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে লতিকা বলেন—"এসো—দোতলার গাড়ীবারান্দায়। ফোয়ারা দেখেছো?" কথাটা বুঝতে না পেরে অরুণ দিদিমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইতে চাইতে বারান্দার রেলিংয়ের কাছে এসে দাঁড়ায়।

দোতলা থেকে অদূরে, নীচের শ্যামল দুর্ব্বাদল আচ্ছাদিত টেনিস্ গ্রাউণ্ড্টার পাশের একটা তারের জালে ঘেরা, কৃত্রিম উঁচু-নীচু পাহাড়ের প্রাচীরে বাঁধানো, ছোট্ট জলাশয়ের ভেতরে ঝরণা দেখিয়ে, লতিকা বল্লেন—"ঐ দেখছো ফোয়ারা? কেমন ফুলে ফুলে জল উঠে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে?"

বিস্ময়ে হতভম্ব অরুণ, সেইদিকে চেয়ে অস্ফুটে বলে উঠলো—"ভারি সুন্দর তো!" তারপর সে তার দিদিমার দিকে চেয়ে বললো, "অতো জল কোথা থেকে উঠে ছড়িয়ে পড়ছে দিদিমা?" তারপর সেই ফোয়ারাটার কাছাকাছি রেলিংয়ের দিকে এগিয়ে গিয়ে খানিকক্ষণ উঁকীঝুঁকি মেরে, খুব হেসে উঠে অরণ বলে,—"দেখেছো দিদিমা,—ক'ত রকমের সব পাখি ঐ বালির ধারের পাথরগুলোর ওপর বসে রয়েছে?"

তারপর আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে সে বলে ওঠে,—"ঐ গুটো বুঝি ময়ূর—না দিদিমা ? কি খাচ্ছে ওরা সব খুঁটে খুঁটে ? ওর ভেতরে ঢুকতে পারা যায়না দিদিমা ? অতবড় জায়গাটা তারের জাল দিয়ে ঘিরে রেখেছে কেন দিদিমা ? পাখিগুলো নইলে সব পালিয়ে যাবে বুঝি ?" তারপর লতীকাদেবীর হাতটা ধরে টেনে, জালে ঘেরা সেই হ্রদের পাশের টেনিস্ গ্রাউণ্ডটা দেখিয়ে অরুণ বলে,—"ঐখানে বুঝি ফুটবল খেলা যায় ? এখানে কারা ফুটবল খেলে দিদিমা ? আমায় খেলতে দেবে ?"

—"এ সবই তো তোমার। ঐ সব পাখি, ঐ ময়ূর,—ঐ ফোয়ারা, এই বাড়ী, এ সবই তো তোমায় দিয়ে দেবো। এসো এখন স্নান খাওয়া করে, দাদুর সঙ্গে গল্প করবে চ'ল। তারপর বিকেল হ'লে, মোটর গাড়ীতে করে তোমাকে তোমার মা বাবার কাছে পাঠিয়ে দেবো। তখন তুমি সেই গাড়ীতে করে তোমার মা, বাবা, মামা, আর তোমার মিনা পিসিকে নিয়ে আসতে পারবে তো ?" এই বলে অরুণকে কোলে তুলেই তার গালে একটা চুমো খেয়ে, লতিকাদেবী হাসি মুখে তার দিকে চেয়ে রইলেন। আশার আনন্দে আত্মহারা, বালক অরুণ তখন, ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে, মাথাটা তাঁর কাঁধের পাশে হেলিয়ে, দুহাতে গলাটা জড়িয়ে ধরে, দিদিমার কোলের ওপরে পা দোলাতে সুরু করলো। তারপর নাতির সঙ্গে দিদিমায়ের সেকি আলাপের ঘটা !

দুপুরের বিশ্রামের পর আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে সরোজবাবু তাঁর স্ত্রীকে বললেন—"কাজটা ভাল হয়নি লতু, রেবতার সঙ্গেই খোকাকে পাঠিয়ে দেয়া উচিৎ ছিল। বিলাস নাকি রেবতীর মুখে, খোকাকে এখানে নিয়ে আসার কথা শুনে খুব রাগ করেছে! মাধবীও খবরটা শুনে মোটেই খুশী হয়নি। ওদের কাছে না ব'লে, অমনি করে খোকাকে নিয়ে আসা তোমার উচিৎ হয় নি!"

স্তম্ভিত বিস্ময়ে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে, লতিকাদেবী বললেন,—"কি করে জানলে? রেবতী টেলিফোন করেছিলেন বুঝি?"

—"হ্যাঁ এইতো একটু আগেই টেলিফোন করেছিলো রেবতী—বিলাসের অফিস থেকে।"

—"কিসের অফিস করেছে বিলাস?"

"—সংবাদ পত্রের অফিস। 'দেশবাসী' বলে একটা নতুন দৈনিক বেরিয়েছে না?—বিলাস সেই কাগজের সম্পাদক।"

"—'দেশবাসী'—কাগজটা বুঝি বিলাসই চালাচ্ছে? কিন্তু অত টাকা ও কোথায় পেলো?"

—"টাকা ওর নয়, সম্পাদক হিসেবে ও শুধু সেখানে চাকরি করছে! চাকরিটা নাকি হালে পেয়েছে; মাইনেও শুনলুম বেশ মোটা টাকাই পাচ্ছে!"

সরোজবাবুর কথা শুনে সহসা যেন একটা মুক্তির নিশ্বাস মোচন করে বাঁচলেন লতিকাদেবী। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে

শেষে তিনি স্বামীকে প্রশ্ন করলেন,—"তাহলে খোকাকে তো আজই পাঠানো উচিৎ দেখ্‌ছি! তুমি নিয়ে গিয়ে দিয়ে আসবে? নাকি আমিই গাড়ী করে ওকে নিয়ে যাবো? ওদের বাসার ঠিকানাটা রেবতীবাবুর কাছে জেনে নিয়েছ তো?"

একটা বুক ফাঁটা নিশ্বাসের ভেতর থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে,—সরোজবাবু বললেন,—"আমাদের কাউকেই যেতে হবে না। রেবতী টেলিফোনে জানিয়েছে, মাধবীর ভাড়াটে বাসার বাড়ীওয়লার বোন—মিনা, না কি যেন একটা নাম, সেই তার দাদার গাড়ী নিয়ে খোকাকে বিকেলে নিতে আসবে!"

"শুন্‌ছিলুম বটে খোকার মুখে মেয়েটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা, —ওকে বোধহয় খুব ভালবাসে মেয়েটি! ক্ষীরোদের হাসপাতালে লেডি ডাক্তারী পড়ছে বলে বলছিল। ক্ষীরোদকেও নাকি খুব মান্য ভক্তি করে!" বলে স্বামীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে, কোনও উত্তর না পেয়ে, লতিকাদেবী কক্ষান্তরে চলে গেলেন।

সরোজবাবুর কেদারার পাশেই অদূরে একটা ছোট স্প্রীংয়ের খাটে শুয়ে, অরুণ তখন অঘোর ঘুমে ঘুমুচ্ছে। তার মাথার পাশে একটা ছোট টেবিল-ফ্যান্ ঘুরাছিল! সেইদিকে কিছুক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখলেন সরোজ বাবু। তারপর কি মনে করে, কেদারা থেকে উঠে গিয়ে দেয়াল আলমারীটা খুলে, তার ভেতর থেকে বের করলেন,—একটা

ছোট্ট সোণার হাত ঘড়ি, একটা ছোট্ট সোণার ফাউন্টেনপেন,—আর বের করলেন একটা কারুকার্য খচিত শান্তিনিকেতনি মানিব্যাগ। তারপর একটা ক্যাশবাক্স খুলে, তার বিভিন্ন খোপ থেকে বের করলেন, রূপোর কতকগুলো কাঁচা টাকা, কোনটা থেকে কতকগুলো আধুলী, কোনটা থেকে সিকি আর আনি। ক্যাশবাক্সের ভেতরের তাক থেকে বের করলেন একতাড়া ছোট-বড় টাকার নোট। শেষে সেগুলোকে হস্তস্থিত সেই মানিব্যাগটার যথা স্থানে সব ভরে, আলমারিটা বন্ধ করে,—সেই সব নিয়ে এসে রাখলেন তাঁর আরাম কেদারার পাশের একটা টিপয়ের ওপরে। আরাম কেদারায় পুনরায় উপবেশন করে সরোজবাবু মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন—রেবতীবাবুর কথাগুলো! টাকাকড়ির ব্যবস্থাটা ধীরেনবাবুর উদ্যোগে হলেও, রেবতীই প্রকারন্তরে ক্ষীরোর হাসপাতালটা দাঁড় করিয়ে দিয়েছে! বিলাসের চাকরীর মূলেও রেবতীর চেষ্টাই কাজ করেছে সব চাইতে বেশী! মুখে রেবতী তা যতই অস্বীকার করুক্! ক্ষীরো আর মাধবীকে নিস্বার্থ ভাবেই স্নেহ করে রেবতী। অথচ জীবন-ভোর তিনি এই রেবতীর সম্বন্ধে কতই না ভুল ধারণা পোষণ করেছেন মনে মনে? বিলাস নাকি খেতে পেতনা সেদিনও, টাকা কড়ি আয়ের কোনও ব্যবস্থা করতে না পেরে ছোকরার মস্তিষ্ক বিকৃতি পর্যন্ত ঘটেছিল; শুধু ধীরেনবাবু আর তার বোনের চেষ্টাতেই—মাধু, না খেয়ে শুকিয়ে মরবার

হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছিল! কোন বাড়ীওয়ালা এ যুগে এমন হোতে পারে বলে কোথাও শোনেন-নি সরোজবাবু! সহসা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস, তীব্র বেগে বেরিয়ে পড়লো সরোজবাবুর চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা দিয়ে! সোজা হয়ে উঠে বসে আর একবার তিনি চেয়ে দেখলেন অরুণের মুখের দিকে! কতো কথাই না ভাবছেন আজ সরোজবাবু! এই মাধবীর পেটের ছেলে, আজ তারি ঘরে শুয়ে কি সুন্দর নিরুদ্বেগে ঘুমুচ্ছে! হয়তো একদিন এই ছেলের এক ফোঁটা দুধের জন্য কতো দুশ্চিন্তাই না করতে হয়েছে মাধবীকে! অথচ এমনিই অভিমানী মেয়ে, যে—মা-বাপকে তার দুর্দ্দশার কথা ঘুণাক্ষরেও জানায় নি সে কোনোদিন! না না মাধবীর দোষ নেই। তিনি যে তাকে ভৎসনা করেছিলেন! বিলাসের সঙ্গে বিয়ে বসলে তিনি তাকে কোনদিনই বিপদে সাহায্য করবেন না বলে—ভয় দেখিয়েছিলেন যে? সে কথা মাধবী তার ঘোরতর দুর্দ্দিনেও ভুলতে পারেনি? বাপকে মাধু সত্যিই বড জব্দ করেছে! বাপ-মায়ের জেদ আর অহঙ্কারকে ক্ষারোদ আর মাধবী সত্যিই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়েছে! অথচ তিনি যে তাদের কতো ভালবাসেন সে কথা তাঁর চাইতে কে আর বেশী জানে? সহসা তাঁর চোখের কোণে দু'ফোটা অশ্রু টলমল করে উঠলো! না-না ক্ষীরোদ আর মাধবী চিরজীবনের মতোই পিতা-মাতাকে বর্জ্জন করেছে! চোখের জলে সরোজবাবুর সম্মুখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এলো।

কোঁচার কাপড় দিয়ে তিনি চোখের কোণ মুছতে লাগলেন। আজ তাঁর যত লজ্জা আর যত দুশ্চিন্তা শুধু লতিকাকে নিয়ে! লতুর হয়তো অনেক সময় অনেক কিছুই ছেলেমেয়েদের জন্য করবার ইচ্ছে হয়েছে, কিন্তু সত্যিই কি তিনি শুনেছেন কোনদিন তার কথা? না না তিনিই অপরাধী! তিনিই এ সংসারের যত অনাসৃষ্টির মূল! নিস্পৃহ ধীরেনবাবু তাঁরই ছেলে মেয়েকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে, নিজের স্ত্রীটিকে পর্যন্ত হারাতে বসেছেন। ধীরেনবাবুর স্ত্রী আজ উন্মাদ-পাগল! ক্ষীরোদের হাসপাতালে আজ তার জীবন কাটছে। অথচ সরোজ বাবু তো অতি সহজেই তার ক্ষীরো আর মাধবীকে পূর্ব্বেই প্রতিষ্ঠিত করে দিতে পারতেন? না-না, আর ভেবে লাভ নেই। ঢিল এখন হাতের বাইরে চলে গেছে। কাকুতি মিনতি করলেও ক্ষীরো আর মাধবী এ জীবনে তাঁর কাছে ফিরে আসবে না। কাপড়ের কোঁচা তুলে তিনি আবার চোখ মুছলেন।

হাতের একটা রঙিন থলেতে ভরে, ফল আর কিছু মিষ্টি নিয়ে এ ঘরে ঢুকেই, স্বামীর চোখে জল দেখে, লতিকা-দেবী সহসা অপরিসীম বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়ালেন! শেষে পাশের চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে পড়লেন।

সরোজবাবু বললেন, "খোকার সঙ্গে ঐগুলো পাঠিয়ে দেবার জন্য এনেছো তো? এগুলোও দিয়ে দিও খোকাকে সেই সঙ্গে,—" বলেই তিনি টিপয়স্থিত রিষ্টওয়াচ, ফাউন্টেনপেন আর মানিব্যাগটার দিকে স্ত্রীকে দেখিয়ে দিলেন!

স্বামীর এই বিপরীত ভাব বৈচিত্রে, মনে মনে মুগ্ধ এবং আনন্দিত হয়ে, লতিকাদেবী প্রশ্ন করলেন,—"কি ভাবছিলে তুমি অমন করে ? একটু হরলিক্স্ দিতে বলবো মেয়েকে ?"

দূরের দিকে চেয়ে উদাস গম্ভীরভাবে সরোজবাবু বললেন, —"তা—বলে দাও ; কিন্তু খোকাকে কি ঘুম থেকে তুলবে না তুমি ? ছু'টো কথাও যে বলা হোলো না ওর সঙ্গে ।" কি যেন ভাবলেন সরোজবাবু । তারপর শেষে বললেন,—"আবার তো একটু পরেই এসে ওরা খোকাকে নিয়ে যাবে, তিনটে তো প্রায় বাজে !" বলেই একটা নিশ্বাস মোচন করলেন তিনি !

লতিকাদেবী স্বামীর পাশে এগিয়ে গিয়ে সহানুভূতির সুরে, তাঁর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন,—"নিয়ে গে'লই বা খোকাকে আজ ; আবার তো ওরা আসবে । আমি তার ব্যবস্থা করেছি ! মিনা মেয়েটি নাকি খুব ভালো, সেই তো আসবে এখানে খোকাকে নিতে ? আমি সব জেনে বুঝে নিয়ে, একটা ব্যবস্থা করে ফেলছি ওদের এখানে নিয়ে আসবার জন্য । তুমি কিচ্ছু ভেব না ?"

উপেক্ষার হাসি হেসে সরোজবাবু বোললেন,—"না লতু ওরা আর আসবে না,—আসতে পারেনা !" কিন্তু কেন যে আসতে পারেনা সে কথার কিছুই তিনি স্ত্রীকে ভেঙ্গে বললেন না । সরোজবাবুর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো । উদ্বেলিত মন তাঁর তখন রীতিমতো বিচলিত হয়ে উঠেছে ।

তাঁর মনের সেই গভীর ব্যাকুলতা চেষ্টা করেও আর তিনি স্ত্রীর কাছে লুকোতে পারলেন না।

সতরো

মিনতীকে দেখে হাসপাতাল থেকে ফেরবার মুখে, সেদিন বিকেলে কি একটা কথা জিজ্ঞেস করবার জন্য ধীরেনবাবু ক্ষীরোদ ডাক্তারের চেম্বারের সুইম্ ডোরে ধাক্কা দিয়েই কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সেই চেম্বারে একলা বসে সুপ্রিয়া তখন কি যেন লিখছিল তার ফাউণ্টেনপেন দিয়ে একাগ্র চিত্তে। সুইম্ ডোরে ধীরেনবাবুর হাত পড়তেই, কোনও আগন্তুক মনে করে, সুপ্রিয়া ভেতর থেকে পরদা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এলো।

বাড়ী চলে যাবেন, কিম্বা ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা করবেন, ভাবতে না ভাবতেই, সম্মুখে সুপ্রিয়ার আবির্ভাব দেখে, রীতিমতো মুস্কিলেই পড়লেন ধীরেনবাবু। অপ্রস্তুত হতে হোলো সুপ্রিয়াকেও।

সেদিন মিটিং-এ ধীরেনবাবুকে দেখবার পর থেকেই, ভুল হচ্ছিল তার হাসপাতালের প্রত্যেক কাজেই। কৌশলে মিনার কাছে সম্পূর্ণ পরিচয় নিয়ে ইতিপূর্বেই ধীরেনবাবু সম্বন্ধে নিঃসংশয় হয়েছিল সুপ্রিয়া। তাতেই নিজেকে লুকিয়ে রাখবার

চেষ্টা সে কম করেনি। কিন্তু সেই চেষ্টা যে এত শীগ্‌গিরই এমনি করে তার ব্যর্থ হয়ে যাবে, এতটা সে কল্পনাও করেনি। অনেক দিনের অনেক পুরনো কথা তখন সুপ্রিয়ার মনে একটির পর একটি করে ভেসে উঠছিল।

ধীরেনবাবুর পাশে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ যে, সে কিসের চিন্তায় মস্‌গুল হয়েছিল, তা তার মনে নেই—। এক সময়ে সুপ্রিয়ার সেই ভাবাবেগ সহসা ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যেতেই সে ধীরেনবাবুর দিকে মুখ তুলে চাইল।

সুপ্রিয়ার সেই অবস্থা দেখে ধীরেনবাবুর মনেও কোন অতীত চিন্তার আবির্ভাব হয়েছিল কিনা জানি না। তিনিও তার দিকে বার কয়েক চেয়ে দেখলেন, এবং শেষে তাকে শুধু প্রশ্ন করলেন—"ক্ষীরোদ বাবু হাসপাতালে নেই বুঝি? কোথায় বেরিয়েছেন?"

প্রশ্ন শুনে—সুপ্রিয়ার বুক ফেটে কান্না আসতে চায়। হায়রে। মানুষের মন! একদিন যাকে না হলে তার মোটেই চলতো না; কতো চিঠি, কতোই না আন্তরীকতার মর্মস্পর্শী আবেদন নিবেদনের ঘটা! আর তারি পরিণাম বুঝি এই! এতদিনের এতো পরিচয়ের যোগসূত্র কি এমনি করেই মানুষের ছিঁড়ে যায়? মুখ দিয়ে একটা ভদ্রতামূলক কুশল জিজ্ঞাসার কথাও কি প্রথমে বেরুলো না? আজও সুপ্রিয়া কার স্মৃতি নিয়ে তবে জগতে বেঁচে রয়েছে? নিজেকে মনে মনে সহস্র বার ধিক্‌কার দিয়ে, একটা মুক্তির নিশ্বাস মোচন করে যেন বাঁচলো সুপ্রিয়া।

ধীরেন বাবু তার বিশুষ্ক মুখ দেখে বললেন—"ভেবেছি জীবনে আমিও অনেক দিন সু, কিন্তু আর কিছুই করা সম্ভব হয় নি! তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো —।" তারপর বললেন—"ডাক্তার এলে শুধু বলো, আমি তাঁর খোঁজ করেছিলাম।" বলেই ধীরেনবাবু স্থান পরিত্যাগ করবার জন্য পা বাড়ালেন।

অভিমানের অশ্রুজলে সুপ্রিয়ার ছ'নয়ন তখন টলমল করছে। কি যেন বলবার জন্য সহসা তার ঠোঁট দুখানা একবার কেঁপে উঠলো। ধীরেন বাবু সেটা লক্ষ্য করে আবার থেমে দাঁড়ালেন! তাঁকে থামতে দেখে, ধরা গলায় সুপ্রিয়া বলে উঠলো—"আমি তো সে জন্য কোনদিন তোমায় কিছু বলিনি। আমাকে আর অযথা অপরাধী করে তোমায় লাভ কি?" তারপর বলে, "কাজের যদি কিছু তাড়া না থাকে চ'ল-না ভেতরে বসবে একটু! এখানে এ-ভাবে দাঁড়িয়ে থাকাটা..." বলতে বলতেই সুপ্রিয়া চেম্বারের ভেতরে ঢুকে হাতের রুমাল দিয়ে নিজের চোখ দুটো খুব ভাল করে মুছলো। পেছনে পেছনে চেম্বারের ভেতরে প্রবেশ করেই, ধীরেন বাবু সুপ্রিয়াকে বললেন—"আজও তোমাকে আমি ভুলতে পারিনি। সে কথা কি বিশ্বাস করবে সু? যৌবনের শেষ কোঠায় পা দিয়ে আজ শুধু এই নিভৃতেই তোমাকে বলা যায়—আজো আমি তোমায় ভালবাসি! এখানে তুমি কবে এসেছ, কি করছো;—তার বিন্দু বিসর্গও আমি জানিনা! কিন্তু তবুও, এই জীবনের মধ্যাহ্নে আজ

যদি একটা শেষ অনুরোধ তোমায় করি ?—তা হলে সেটা কি, অন্ততঃ পরিচিত বলেও রক্ষা করবে ?"

হর্ষ-বিষাদে সুপ্রিয়ার মন তখন উৎক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত দোল খাচ্ছিল! ধীরেন বাবুর কথার উত্তর দিতে গিয়ে, সে বলে বসলো—"আমায় নিয়ে একবার নতুন করে সংসারী হতে চাও, এইতো ?"

সহসা দাঁতে জিভ্ কেটে ধীরেন বাবু বললেন,—"না সুপ্রিয়া সে দুঃসাহস আমার নেই! আমি তোমাকে চাকরীর পরাধীনতা থেকে অব্যাহতি দিতে চাই। আমি জানি কাজ ছাড়া তুমি বাঁচতে পারবে না, কিন্তু স্বাধীন ভাবেও তো সে কাজ তুমি করতে পারো? সেজন্য যা টাকা লাগবে সেটা আমিই সব ব্যবস্থা করে দেবো।"

সহসা খিল খিল করে হেসে উঠে সুপ্রিয়া বলে—"মেয়েমানুষ কারো অবলম্বন ছাড়া জগতে কোথাও কোন বৃহৎ কাজের প্রতিষ্ঠা করে কৃতকার্য হয়েছে বলে শুনেছো? টাকায় আমার প্রয়োজন কি? শুধু নিজের জীবন ধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন তাই নিয়েই তো আমি আজও ব্যপৃত রয়েছি! তুমি তো জানো বাবার মৃত্যুর পর থেকে জগতে আমার আর কোন অবলম্বনই নেই! পৈত্রিক সম্পত্তি যেটুকু ছিল সেটুকুও আমার এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়কে বিলিয়ে দিয়ে, চাকরী করে করেই তো জীবনের দিনগুলি প্রায় কাটিয়ে এনেছি! এখন আর কার জন্য, কিসের আশায়?—জীবনের এই বয়সে অযথা তোমার

কতগুলো টাকা নষ্ট করে, কলঙ্কের বোঝা ভারি করে তুলবো ?”

“কলঙ্ক ?—তা হবেও বা ! কিন্তু আমার কাছে চিরকালই তুমি থাকবে অকলঙ্ক,—তেমনি উজ্জ্বল ! তোমার সম্বন্ধে কারো কাছেই আমার নালিশ করবার কিছু নেই ! কিন্তু এমন ক'রে আজ আমায় উপেক্ষা করলে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি করে হবে সু ?”

“তুমি ভুল বুঝো না ! উপেক্ষা তোমায় আমি এতটুকুও করিনি। আজ এই যৌবনের চরম প্রান্তে পৌঁছে, অযথা তোমাকে ব্যতিব্যস্ত করে আমার লাভ কি ? পৃথিবীতে কেউ নেই আমার ! যৌবনের গোড়ায় হয়তো তোমায় ভাল বেসেছিলাম,—কিন্তু তারপর তুমি সংসারী হয়েছো,—আমি অক্ষম তাই আর কাউকেই ভালবাসতে না পেরে, সেবাব্রত গ্রহণ করে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছি ! বেশ রয়েছি আমি। তুমিও তো অসুখী নও ! কিসের দুঃখ্যু তোমার ? জন্মান্তরের অভিশাপ আমাকে সারাটা জীবনই তো প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে মারছে ; আমার জন্য তোমাকে আর কোন প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না !”

উন্মুক্ত বাতায়ন পথে, দূরের দিকে দৃষ্টি হারিয়ে ধীরেনবাবু বেদনার হাসি হেসে বললেন--“বাহ্যিক দুঃখ্যু, অভাব, অভিযোগ আমার পূর্বেও ছিল না, এখনো নেই ! হয়তো সেইটেই আমার জীবনেব চরম অভিশাপ ! আজ যৌবনের শেষ কোঠায় পা দিয়ে, কেবলি কি মনে হচ্ছে জানো ? আমি যদি সত্যিকারের

একজন দরিদ্র হতাম? যদি উদয়াস্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খেটে মরতে হোত আমাকে, তাহলে হয়তো তোমাকে পেতাম। তাতে যদি দুঃখ্য আমার বেড়েও উঠতো—তা হলেও বোধহয় আজ আমাকে এতবড় অশান্তির বোঝা বয়ে বেড়াতে হোত না!"

"এটা শুধু তোমার কল্পনার কথা! এভাবে তুমি নিজেকেই প্রতাড়িত করতে পারবে, কিন্তু এ বিশ্বের একটি প্রাণীও তোমার এই বেদনায় সহানুভূতি করবে না। এ কথা অবশ্য আজ তোমাকে বলবার আমার কোন অধীকারই নেই; কিন্তু একদিনও তোমার সঙ্গে আমার যেটুকু পরিচয় হয়েছিল তাকেই উপলক্ষ করে, বোধহয় আজ বলতে পারি, এ জগতে ভাল তুমি কাউকেই বাসোনি। তা যদি বাসতে, তাহলে উচ্ছ্বসিত যৌবনের গোড়া থেকে ভীরুতাকে নিজের মনে প্রশ্রয় দিতে না। আজ তুমি আমাকে যা বোলতে চাচ্ছ, সেটা হচ্ছে তোমার ভীরু জীবনের অকরুণ ক্রন্দন।"

কথা শুনতে শুনতে ধীরেন বাবুর মুখখানি গ্লানিমায় আচ্ছন্ন হয়ে উঠছিল। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে শুধু বল্লেন—"যাক! এর পর আর তোমাকে আমার বলবার কিছু নেই! শান্তি চাও তো আমাকে ভুলতে চেষ্টা কোরো।" বলেই তিনি উদ্‌ভ্রান্তের মতো চেম্বার থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন! সেইদিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে অনুভূতির একটা তীব্র কশাঘাতে সুপ্রিয়ার চোখ বেয়ে ঝর্ ঝর্ করে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো।

ধীরেন বাবু যখন বাড়ীতে ফিরলেন তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। সিঁড়ি দিয়ে তেতলায় উঠবার পথে তিনি দোতলার বিলাসের বৈঠখানার দিকে চাইতেই দেখলেন, রেবতীবাবু, বিলাস আর মাধবীর সঙ্গে গল্প করছে। সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে ধীর পদক্ষেপে উপরে নিজের কক্ষে প্রবেশ করে তিনি ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন। মনে তার আজ কিছুই আর ভালো লাগছিল না! সহসা ইজিচেয়ার থেকে উঠে গিয়ে তিনি তাঁর তেতলার বারান্দায় পাইচারী সুরু করলেন। সুপ্রিয়ার শেষ কথা কয়টা পাক খেয়ে খেয়ে তখনো তাঁর মনের ভেতরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সুপ্রিয়া আজ তাঁকে যে চরম শিক্ষা দিয়েছে তা তিনি নানা ভাবে নানাদিক থেকে চিন্তা করে দেখে, মনে মনেই অনুশোচনায় পুড়তে লাগলেন। সুপ্রিয়া সম্বন্ধে তাঁর মনের কোণে যে বাসনাটা এতদিন ভবিষ্যতের সোনার স্বপ্ন রচনা করে বেড়াত; সে যেন অতি অকস্মাৎ আজ তাঁকে পরিত্যাগ করে চলে গেছে। সুপ্রিয়ার কাছ থেকে বিদায় নেবার পর ধীরেন বাবু ভাবছিলেন,—হায়রে কল্পনা আর অন্ধ ভবিষ্যৎ! তোমরা এতই নিষ্ঠুর এমনিই বিশ্বাস ঘাতক? ধীরেন বাবু বুঝলেন, অতীত, বর্ত্তমান আর ভবিষ্যৎ এদের কারোই কোন অস্তিত্ব নেই এ জীবনে। বেঁচে থাকে শুধু মানুষের নেশা আর চালিয়ে নিয়ে বেড়ায় তাকে তার অন্ধ ভবিষ্যতের আশা। এই তো মানুষের যোগ্যতা! আজ যাকে সে আগ্রহে বুকে তুলে নিলো, কালকেই আবার কোনও অসতর্ক

মুহূর্ত্তে পথিপার্শ্বে তাকেই সে ফেলে চলে যায়। মহৎ চিন্তার দ্বারা নিজের ব্যক্তিত্বকে পরিমার্জ্জিত করতে না পারা পর্যন্ত, মনুষ্যত্বের কোন অস্তিত্বই এ জগতে স্থায়ী হয় না। ভাল, মন্দ, সুন্দর, কুৎসিত, সৎ, অসৎ, এ সবই বিভিন্ন মানুষের জ্ঞান এবং রুচিভেদের মাপকাঠিতেই বিচার হয়ে থাকে। সে দিক থেকে দেখলে, মিনতী, সুপ্রিয়া, কিম্বা মাধবী, প্রত্যেককেই ভিন্ন ভাবে বিচার করা চলে। কিন্তু আসলে তারা এক জায়গায় সবাই যে এক এইটুকুই ধীরেন বাবু শেষ পর্যন্ত বুঝে দেখলেন।

—"শুনছো দাদা, সরোজ বাবু মরণাপন্ন কাতর।" চিন্তার খেই হারিয়ে সহসা বোনের কথার উত্তরে ধীরেন বাবু বললেন—"কি অসুখ হয়েছে তাঁর?"

—"পাঁচ-টা মেশানো রোগ। বুড়োদের যেমন হয়। একবার দেখেই এসো না। প্রায়ই তোমার নাম করেন।"

চিন্তান্বিত ভাবে ধীরেন বাবু বললেন—"কৈ আমাকে তো কেউ বলেনি সে কথা?" তারপর একটু ভেবে বললেন, "দেখবো যদি কাল যেতে পারি। কিন্তু তোমায় তো বুড়োবুড়ি দুজনেই খুব ভালবাসেন—তা তুমি কে'ন ইতিমধ্যে একবার গিয়ে দেখা করে এসো না?"

"বা-রে! হাসপাতালের তরফ থেকে আমি তো প্রায়ই যাচ্ছি! নইলে জানলুম কি করে? কিন্তু গিয়ে এমন লজ্জায় পড়ি যে-তা আর বললে ফুরোয় না! কেবলি বুড়ো, তার ছেলে মেয়েকে এনে দেবার জন্য আমায় অনুরোধ করবে।

কি করি বল দেখি ? মা-মা-করে একেবারে পাগল করে মারে যে'ন বুড়িটা !

"কেন ?—তোমার বৌদি, বিলাস বাবু, ডাক্তার চৌধুরী, এঁরা যাবেন না তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ? এখন এতদিনে এঁদের তো বুড়োবুড়ির ওপরে কোনও অভিমান থাকা উচিত নয় ?"

"সে কথা কে আর কাকে বলবে ? মাধবী বউদিকে কিছু বললেই সে কাঁদতে থাকে ! অরুণ বেচারীকে, সেই যে নিয়ে এসেছি তার পর থেকেই লুকিয়ে লুকিয়ে রোজ এসে আমার কাছে কাঁদে আর বলে, 'একবারটি নিয়ে চলো না পিসি আমাকে আমার দাহু আর দিদিমার কাছে ! আমায় তাঁরা কতো ভালবাসেন,—কিন্তু বাবা কেন ওঁদের কথা শুনলেই চটে যান পিসি ? ওঁরা ক'ত ডাকছে আমাকে তুমি তো জানোনা ? তবুও কে'ন আমাকে যেতে দিতে চান না বাবা-মা ?' ছেলেটার কথা শুনলে আমার বড্ড কান্না পায়। নিয়ে যেতে পারি না ওর মা বাবার জন্য, অথচ কি আমি কাকে বলবো ব'লতো ?" তারপর একটু ভেবে মিনা বলে "আচ্ছা দাদা, তুমি একবার ডাক্তার চৌধুরীকে বুঝিয়ে বলতে পার না ? উনি একবার গেলে হয়তো বুড়োবুড়ি দুজনেই অনেকটা আশ্বস্ত হবে ! বলবে তুমি একবার ডাক্তার চৌধুরীকে ?"

"দেখবো আমি একবার চেষ্টা করে, কিন্তু ব্যাপারটাতো কিছুই তুমি বুঝতে পাচ্ছ না কি না ? সেই তো মুস্কিল ! পরের

কোনও সাংসারিক ব্যাপারে মাথা গলাতে যাওয়াটা তো ভাল কথা নয়! কাজটা হচ্ছে কোনও নিকট আত্মীয়ের। কিন্তু সরোজ বাবু কোন দিনই তার কোন আত্মীয় স্বজনকে গ্রাহ্য করেন নি। লক্ষ্মীর বর লাভ করে অপরিযাপ্ত ধনের অধিকারী হয়ে, তিনি পৃথিবীতে জন্মে অবধি শুধু নিজের অর্থ আর সামর্থেরি পূজো করে এসেছেন। আজ বার্দ্ধক্যের শেষ কোঠায় দাঁড়িয়ে তিনি তার গত জীবনের ভুলের বিভীষিকা দেখছেন! সেই অনুশোচনাই হয়তো তাঁকে মৃত্যুর তীরে ঠেলে নিয়ে যাবে শেষ পর্য্যন্ত।"

মিনা বলে,—"না না! বুড়ো সহজে মরবে না দাদা, তুমি দেখে নিও! বিলাসদার কথা অবশ্য আমি বলতে পারিনে, কিন্তু ঐ মাধবী বৌদি আর ডাক্তার চৌধুরীর মুখ দর্শন না করা পর্যন্ত বুড়ো মরতেই পারে না। তোমায় বললে বিশ্বাস করবে না দাদা—একটা ছোট ছেলে যেমন তার একটা হারানো প্রিয় বস্তুর খোঁজে আহার নিদ্রা ভুলে, তাকে কেঁদে কেঁদে খুঁজে বেড়ায়,—ছেলে মেয়ের জন্য বুড়োবুড়ির ঠিক সেই অবস্থা হয়েছে।"

মুচ্‌কি হেসে ধীরেন বাবু বললেন—"তা মন্দ কি? বেড়াবার নাম করে মোটরে তুলে একদিন নিয়েই যাওনা সেখানে তোমার বউদি আর তার ছেলেকে! হাজার হোক বুড়ো মানুষ তো? তোমার বউদির কিছু লাভ হোক কি না হোক, তোমার তো কিছু লাভ হতে পারে?"

উচ্ছ্বসিত আনন্দে আত্মহারা হয়ে মিনা উত্তর দেয়,—"তা হবে বই কি ? তোমায় যখন বলেছে ! সম্পত্তির অর্দ্ধেকটাই শেষ পর্যন্ত আমার নামে লিখে দেবে বুঝি ?"

মহা বিস্ময়ে মিনার দিকে টানা তুই চক্ষু বিস্ফারিত করে, ধীরেন বাবু বললেন—"উড়িয়ে দেবার কথা আমি একটিও বলছিনা কিন্তু ! বুড়োর ছেলে একজন কতবড় ডাক্তার তা জানতো ? তুমিও আবার তারি কলেজের একজন লেডি ডাক্তার হয়ে উঠ্‌ছো, তা ছাড়া বুড়োবুড়ি তো তোমাকে রীতিমত ভালবেসেই ফেলেছে ! সেই তোমার চেষ্টায়,—বুড়োবুড়ি যদি শেষ জীবনে তাঁদের ছেলে মেয়ের মুখ দেখতে পায়, সেটা কি বড় সোজা লাভের কথা ? সেখানে সম্পত্তি তো কোন্ ছাড়,—আরো কতো কিছু তোমায় দিয়ে দিতে পারে, তা তো আর ভেবে দেখনি ?"

"বুড়োবুড়ি আমাকে ভালবেসে ফেলেছে না ছাই করেছে। বয়ে গেছে তাদের আমাকে ভাল বাসতে ! আমি কি তাদের মাধবী না ক্ষীরোদ ?" বলেই সহসা অন্যদিকে মুখটা ফিরিয়ে, দাঁতে জীব কেটে নিয়ে, ধীরেন বাবুর দিকে চেয়ে আবার মিনা বলে,—"পয়সাওয়ালা ভদ্রলোকেরা কার্যোদ্ধারের জন্য অমন ভালবাসার ভান অনেককেই দেখায় !—সম্পত্তি না হাতি দেবে আমাকে ! সেই হাতীতে চড়ে তুমিই গিয়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে এসো ! আমি চললুম,—আজ আবার হাসপাতালে ডিউটি রয়েছে।

মিনা চলে যাবার কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই রেবতী বাবু, পরদা ঠেলে ধীরেনবাবুর কক্ষে প্রবেশ করলেন। দাঁড়িয়ে উঠে তাঁকে অভ্যর্থনা করেই ধীরেন বাবু প্রশ্ন করলেন—"আপনাকে বড্ড শুক্‌নো শুক্‌নো দেখাচ্ছে যেন? কিছু অসুখ করে নি তো?"

এক গাল হাসি হেসে রেবতী বাবু বললেন—"শরীর থাকলে রোগ হবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি! কিন্তু আপনার স্ত্রী কেমন আছেন?"

"—আজ বিকেলে যা দেখে এলুম তাতে অনেকটা সুস্থ বলেই মনে হল। তবে, ডাক্তার পাল বললেন,—পুরোপুরি সুস্থ হ'তে এখনো পাঁচ সপ্তাহ সময় নেবে। তিনি তো আমাকে ভরসার কথাই বললেন।"

দূরের দিকে ক্লান্ত বিষন্ন দৃষ্টি মেলে রেবতীবাবু বললেন,—"ভালো যে উনি হবেন এ কথাতো আমি ডাক্তার না হয়েও জোর করে বোলতে পারি। স্নায়ুশূল রোগটাই হচ্ছে ওঁর প্রধান অসুখ, সেকথা ইতিপূর্ব্বেই ক্ষীরোদের কাছে আমি শুনেছিলাম। আর যা সব বাড়াবাড়ি দেখেছেন তা ঐ রোগেরি লক্ষণ বৈচিত্র্য। ওঁর রোগ মুক্তি সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্তই রয়েছি কিন্তু মুস্কিলে পড়েছি ক্ষীরোদের বাবাকে নিয়ে।"

"—মিনাও একটু পূর্ব্বেই বল্‌ছিল বটে তাঁর কথা।" বলেই ধীরেন বাবু তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। রেবতীবাবু বললেন—"আমি বুঝতেই পাচ্ছিনা—সরোজ হঠাৎ ছেলে-মেয়ে ছেলেমেয়ে করে এমন পাগল হয়ে উঠ্‌লো কেন? সেদিন

মিটিংয়ের শেষে অরুণকে নিয়ে যাবার পর থেকেই দেখছি সরোজের চরিত্রে এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন এসেছে। অরুণ চলে আসবার দিন তিনেক পর থেকে, সরোজ পুরোপুরি শয্যা গ্রহণ করেছে। সেই কথাই বলছিলুম বিলাস আর মাধবীকে। বল্লুম তো ছেলেটাকে নিয়ে যাবার জন্য মাধবীকে অনেক করে। কি করবে তা ওরাই জানে!" তারপর একটু চিন্তা করে বললেন,—"সময় করে আপনিও কাল পরশু একদিন গিয়ে দেখে আসুন না? আমাকে বল্‌ছিল কালকেও। বোধহয় কিছু দরকার আছে আপনাকে।"

—"বেশ তো, বলবেন সরোজ বাবুকে,—যদি পারি তো কালকেই আমি দেখা করে আসবো।"

—"আচ্ছা তা হলেআমি উঠ্‌ছি, রাত্রিও অনেক হোল; এর পর আবার সরোজের ওখানে যেতে হবে। আজই বলবো আমি সরোজকে আপনার কথা।" বল্‌তে বলতে তিনি নমস্কার জানিয়ে উঠে পড়লেন।

আঠারো

গত কয়দিন থেকেই সরোজ চৌধুরীর রোগ একটা অদ্ভুত পর্য্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে। সহরের বড় ডাক্তার কবিরাজ কাউকেই ডাকতে লতিকা ক্রোটী করেন নি! কিন্তু কি যে তাঁর রোগ তা সঠিক কেউ ধরতে পারছে না। অথচ দিন দিন যে তিনি দুর্ব্বল হয়ে পড়ছেন, এ-টা কিন্তু প্রত্যেকের নজরেই ধরা

পড়ছে। সম্মুখে কাউকে পেলেই তিনি বকতে থাকেন অনর্গল। ডাক্তার, নার্স, কিম্বা লতিকা দেবী সে জন্য তাঁকে কিছু বলতে চেষ্টা করলেই অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হন! লতিকা দেবী ধরেই নিয়েছেন স্বামীর এত বয়সের এ রোগ আর সারবে না; কিন্তু তবুও তিনি চেষ্টায় কার্পণ্য করেন নি এতটুকুও। চব্বিশ ঘণ্টার জন্য এ্যাটেণ্ডিং ফিজিশিয়ান্ থেকে সুরু করে পালাক্রমে দু'জন নার্স এবং একজন কম্পাউণ্ডারকে বাড়ীর ভেতরেই একটা বড় হল ঘর ছেড়ে দিয়ে রেখেছেন। ফাঁই ফরমাজ্ খাটবার জন্য রেখে দিয়েছেন দু'জন ছোকড়া চাকর। আর দিবারাত্রির জন্য গেটে মোতায়েন রেখেছেন, একখানি ছোট মোটরকার। পরিচিত বন্ধু, বান্ধব এবং আত্মীয় স্বজন, সকলকেই লতিকা সরোজবাবুর অসুখের খবরটা জানিয়ে দিয়েছেন। তার ফলে, সকালে এবং বিকেলে মোটর গাড়ী আর আগন্তুকদের যাতায়াত অনবরতই চল্‌ছে।

দোতলার একখানি বিরাট হল ঘরের ভেতরে অসুস্থ সরোজ চৌধুরীর শয্যা রচনা করা হয়েছে. এবং ঠিক সেই শয্যাটির অদূরেই একখানি ছোট খাটে, পরিচ্ছন্ন একটি ছোট্ট বিছানা পাতা রয়েছে। আগন্তুকবর্গ বিস্মিত নয়নে শুধু সরোজবাবুর মুখের দিকে চেয়ে থেকে, তাঁর কথা শুনতে শুনতে, আস্তে আস্তেই আবার ফিরে চলে যায়। এত টনটনে জ্ঞানী লোকের রোগটা যে কি হোল, তা কিন্তু কেউ আর বুঝতেই পারে না।

ছোট্ট বিছানাখানির দিকে এক-একবার নজর দিয়ে,

আগন্তুকদের দিকে চেয়ে চেয়ে, সরোজবাবু বলেন,—"লতু বুঝি খবর দিয়েছে? তাই বুঝি আপনারা সব দেখা করতে এসেছেন? বেশ! বেশ! তা অসময়েই তো লোক-লোককে দেখতে আসে! আপনারা ভয় পাবেন না—আমি ঠিক সেরে উঠবো!" তারপর নিজের মনেই যেন বলতে থাকেন, "একটু পরেই দেখতে পাবেন আমার নাতিটি এসে ঐ বিছানায় খেলা করবে। ঐ ছেলেটাই দেখছি আমাকে আর মরতে দেবে না! দাদু দাদু বলে কত কি যে বলে,—বুঝে উঠতে পারিনে। মুখে যেন খই ফুটছে। ঘুমোবার জো নেই। দু'চোখ এক করেছি কি আর অমনি এসে ডাকতে সুরু করবে, 'দাদু তুমি ঘুমুচ্ছ?' কি যে চঞ্চল তা আর বলতে পারিনে।" তারপর তিনি কিছুক্ষণ দু'চোখ বুজে পড়ে থাকেন।

* * *

সেদিন রেবতীবাবু চলে যাবার পর সরোজবাবু একজন নার্সকে দিয়ে লতিকাকে ডেকে পাঠালেন। লতিকা কক্ষে প্রবেশ করলে নার্সকে তিনি সরে যেতে ইঙ্গিত করে স্ত্রীকে বললেন,—"কৈ ওরা তো এলো না লতু? তোমার অরুণও তো কৈ আর এলো না! তোমরা আমায় এমন করে মিথ্যে আসা কে'ন দিচ্ছ লতু? ওরা আর আসবে না!"

স্বামীর এই শেষ বয়সের, নাতি বাৎসল্যের ব্যথা, লতিকা যেন আর কিছুতেই সহ্য করতে পাচ্ছেন না! বুকের ভেতরটা তাঁর ফেটে চৌচির হয়ে যেতে চায়। 'হায়রে

সন্তানের অভিমান! তোরাই শেষ পর্য্যন্ত বাপটাকে এমনি করে মারবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিস?' কিন্তু মনের সে অবস্থা স্বামীর কাছে তিনি সম্পূর্ণভাবে গোপন ক'রে বলতে সুরু করেন,—"—ওদের যদি ইচ্ছে না-ও থাকে ;—তবুও তোমার ক্ষীরোদ বা মাধবী কারোই রেবতীবাবুর কথা ফেলবার সাধ্য নেই—তা জানো তো? রেবতীবাবু যখন বলেছেন ওরা আসবেই, তখন তো তোমার উতলা হবার কোন কারণ নেই। খাওয়া-দাওয়া সেরে আসবে তো মাধবী!—বিলাসের অফিস রয়েছে না? ক্ষীরোদের আবার হাসপাতাল। সে তো তার কাজ সেরে চেম্বার থেকেই বেরুতে পারে না বেলা একটার আগে শুনেছি। তা এক্ষুণি আসবে কি করে? তবে অরুণকে নিয়ে, মিনা যাতে আগে চলে আসে, সে জন্য আমি পূর্ব্বেই ধীরেনবাবুর বাড়ীতে টেলিফোন করেছি।"

"—আহা! বেশ কাজ করেছ' গো! বড্ড ভালো কাজ করেছ'! ঐ দুষ্টু সয়তানটার কান দুটো না মলে দিতে পারা পর্যন্ত আমার আর শান্তি নেই! এবার আমি একটুখানি ঘুমিয়ে নি তা হলে?"

—"নিশ্চয়! ঘুমুবে বই কি! সারারাত তো শুধু ডাক্তার আর নার্সদের সঙ্গে গজর গজর করে মরেছো, এখন একটু ঘুমিয়ে নাও। খোকা এসে পড়লে কি আর তোমাকে ঘুমুতে দেবে?" বলেই তিনি স্বামীর মাথায় হাত বুলোতে সুরু করলেন।

দুপুরের পর ক্ষীরোদকে সঙ্গে নিয়ে সরোজবাবুর কক্ষে প্রবেশ করে, রেবতীবাবু একটা চেয়ার টেনে তাঁর শয্যার সম্মুখে বসতে বসতে বললেন,—"একবার চেয়ে দেখ দেখি চিনতে পাচ্ছ কিনা? কাকে সঙ্গে এনেছি?"

রেবতীবাবুর কথা শুনেই বিস্ফারিত নেত্রে ক্ষীরোদের দিকে চেয়ে, বিছানার ওপর ঠেলে উঠে বসবার চেষ্টা করতে লাগলেন সরোজবাবু। দু'পাশ থেকে লতিকা দেবী তাড়াতাড়ি দুটো বড় তাকিয়া সরোজবাবুর দুপাশে ঠেলে দিতেই তিনি সেই তাকিয়া হেলান দিয়ে, অনেকটা উঁচু হয়ে বসে ক্ষীরোদকে হাত ইসারায় পাশে ডাকলেন। পিতামাতার চরণ স্পর্শ করে, প্রণাম জানিয়ে, পূর্ব্বেই ক্ষীরোদ গিয়ে তার বাপের মুখের কাছে এগিয়ে বসেছিল। ছেলের মাথায় এবং পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে সরোজ রায় বললেন—"আমি তখন বুঝতে পারিনি ক্ষীরো সেই জন্যই তোমাকে চেম্বার খুলে দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তুমি আমায় রীতিমত পরাস্ত করেছ। আজ আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি। যা কিছু স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি রয়েছে, আজ থেকে সে সবই তোমার! তুমি আমার বংশের একমাত্র প্রদীপ! আমার সমস্ত দায়ীত্বের বোঝা তুমি গ্রহণ করে আমাকে নিস্কৃতি দাও ক্ষীরো! একদিন বাপ সেজে তোমাদের মানুষ কারছি আজ এই স্থবির দেহ নিয়ে বার্দ্ধক্যের তীরে এসে দাঁড়িয়েছি। আমার সমস্ত তিরস্কার, উপেক্ষা, ভুলে যাও; আমায় শান্তি দাও।

তুমি আমায় মার্জ্জনা করো ক্ষীরো !" বলেই তিনি ভীষণভাবে হাঁপাতে লাগলেন। পিতার সেই অবস্থা দেখে, পকেট থেকে ষ্টেথিস্কোপ্‌টা বের করে ক্ষীরোদ ডাক্তার বেশ ভালো করে পিতার বুক পরিক্ষা করলো। তারপর বললো,—"আমাকে ভুল বুঝবেন না বাবা, আপনি কোনদিনই আমার প্রতি অবিচার করেন নি। অকারণ লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে, ভুল করেছিলাম আমি। সেজন্য আপনি আমাকে মার্জ্জনা করুন !"

—"মার্জ্জনা ?—নিশ্চয় মার্জ্জনা কোরবো ! তুমি তো রাস্তার লোক নও ক্ষীরোদ—তুমি যে আমার সন্তান",—এই কথা বলতে বলতে সরোজ রায়ের চক্ষে জল এসে পড়লো। তখন, কম্পিত হস্তে তিনি বালিশের তলা থেকে একটা উইল বের করে, ক্ষীরোদের হাতে তুলে দিতে দিতে বললেন—"এই নাও ক্ষীরো এটা আমি ইতিপূর্ব্বেই ধীরেনবাবুকে দিয়ে সম্পন্ন করিয়ে রেখেছি ! বালিগঞ্জে, দেশ-প্রিয় পার্কের অনতিদূরে যে নতুন বাড়ীটা তোলা হয়েছে—ঐটে ; আর ধীরেনবাবুর ব্যাঙ্কের fixed deposit-এর টাকা কয়টা আমি শুধু মাধবীর ছেলেকে দিয়েছি।—আর…" তারপর তিনি হাঁপাতে লাগলেন। পিতার অবস্থা দেখে ক্ষীরোদ ডাক্তার এক নিমেষে পকেট থেকে একটা ছোট্ট সিরিঞ্জ বের করে, তাতে একটা ইনজেকশন ভরে, সরোজবাবুর দক্ষিণ বাহুতে কৌশলে ফুটিয়ে দিতে দিতে বললো—"এত সব কিছুই করবার দরকার ছিল না বাবা। দিদিকে তো আমি কোন দিনই পর ভাবতে পারবো না। দিদির নামেই তো এ বাড়ীটাও লিখে

দিতে পারতেন। মায়ের পর, এ সংসারে দিদি বই আমাকে দেখবার আর তো কেউ থাকবে না বাবা!"

—"সব ভারই তো তোমার উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছি! এখন যা কিছু করবার সবই তুমি!" তারপর অনেকটা আশ্বস্ত হ'য়ে বললেন—"কি ইনজেকশন আমাকে দিলে ব'লতো? শরীরটা সহসা বেশ সুস্থ বোধ কচ্ছি যেন? ভারি আরাম পাচ্ছি তো! বুকটা যেন হালকা হয়ে আসছে। বেশ খিদেও পাচ্ছে যেন আমার!"

সে কথা শুনে, রেবতীবাবু মুখ তুলে লতিকা দেবীর দিকে চেয়ে বললেন,—"বৌদি সরোজকে কিছুটা হরলিকস্ খাইয়ে দিন।" উঠে দাঁড়িয়ে ক্ষীরোদ, তখন লতিকা দেবীকে উদ্দেশ্য করে বললো,—"মা তোমার মেনকাকে কিছুটা জল গরম চাপিয়ে দিতে বলো, আমি এক্ষুনি ফিরে আসছি।" তারপর সে কোথায় যেন গট-গট করে নেমে বেড়িয়ে গেল।"

ক্ষীরোদ চলে গেলে রেবতীবাবু বললেন—"ছেলেকে এবার ফেরৎ পেলে তো? যত সব তোমার পাগলামি দেখে-দেখে, গোটা সংসারটার ওপরেই আমার অভক্তি ধরে গেছে।"

—"তুমি তো সে কথা বলবেই রেবতী— ; সংসারের ছোঁয়াচ যে তোমার গায়ে কোনদিনই লাগেনি ভাই।" তারপর ধীরে ধীরে তিনি বলতে সুরু করলেন, "অনেক দিনের অনেক কথা আজ মনে পড়ছে রেবতী—! দু'-এক বছরের ছোট বড় আমরা, কলেজ ছেড়ে দিয়ে স্বদেশী মুভ্‌মেণ্টের কাজে লাগলে তুমি।

সত্যাগ্রহ করতে গিয়ে জেল খাটলে। সেখান থেকে বেরিয়ে মহাত্মা গান্ধী আর সি. আর. দাশের দলে যোগ দিয়ে, কংগ্রেসের কাজে মত্ত হয়ে উঠলে। আমাকে দলে ভেড়াতেও তো চেষ্টার কসুর করো নি? কিন্তু ঐ পথটা কেমন যেন আমি বরদাস্তই করতে পারিনি তখন। মামার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি তখন আমার হাতে এসে গিয়েছে। মামিমার চেষ্টায় বিলেত থেকে ব্যারেস্টারী পাশ করে এদেশে ফিরলুম আমি। তারপর পেলুম লতিকাকে বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান। শ্বশুর মশাই মরবার সময় আমাকে ডেকে নিয়ে তাঁর সমস্ত বিষয় আশয় লিখে দিলেন লতিকার নামে। আমাকে বললেন,—'লতিকা আমার বড্ড অভিমানী, ওকে তুমি কোনদিন আঘাত দিও না সরোজ।' আনন্দের আতিশয্যে তারপর আমি চুটিয়ে সুরু করে দিলুম ব্যারিস্টারী ব্যবসা। এক বৎসরের ভেতরেই ব্যারিস্টারীতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে বসলুম। এই বাড়ী তখন উঠ্‌ছে। ক্ষীরোদ তখন সেণ্ট্‌ জোভিয়ারে পড়ছে। মাধবীকে বেথুন থেকে ট্র্যান্স্‌ফার করলুম ডায়োসিশন কলেজে। আবার তুমি এলে আমার কাছে কংগ্রেসের পরোয়ানা নিয়ে। সাহায্য তোমায় আমি তখনো করেছি কংগ্রেসের নাম শুনে। কিন্তু তখনো ঠিক বুঝতে পারিনি, বিশ্বাস করতে চাইনি এই কংগ্রেসের বিশেষত্বকে। কিন্তু সেদিনকার তোমার সেই মিটিংয়ের বক্তৃতা শুনে আর ক্ষীরোদের হাসপাতালের চেহারা দেখে, সত্যিই আমি বিস্মিত এবং মুগ্ধ হয়েছি। সেইখানে বসেই আমি প্রথম উপলব্ধি করলুম,

কাজের ভেতর দিয়েই মানুষের প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, টাকার ভেতর দিয়ে নয়; তাতেই লতিকাকে নির্দ্দেশ দিয়েছিলুম হাস-পাতালের ফণ্ডে ঐ টাকা কয়টা দিতে। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে আজ বুঝেছি—তুমি শুধু আমার বন্ধু নও রেবতী, তুমি আমার সংসারেরও পরম হিতাকাঙ্খী। তোমার কংগ্রেসের কাজের জন্য আমার ভবানীপুরের বাড়ীটা তোমাকে দেবার জন্য ক্ষীরোকে উইলে নির্দ্দেশ দিয়েছি, ওটা তুমি নিয়ে নিও। কিন্তু তোমার অন্য সব ঋণ যে আমি জীবনে কি করে পরিশোধ করবো তা আজও ভেবে উঠতে পারিনি।" তারপর তিনি ভাবতে লাগলেন।

রেবতী বাবু আস্তে আস্তে বললেন,—"যা করেছ এই আমার পক্ষে যথেষ্ট! কংগ্রেসকে কিছু করা মানেই তো আমাকেই করা হোল—এবং এতেই তোমার সব ঋণ আমাকে পরিশোধ করা হয়েছে। এখন তুমি সেরে উঠলেই আমি নিশ্চিন্ত হয়ে কাজ করতে পারি।"

সরোজবাবু বললেন—"বিলাস বোধহয় মাধুকে আর আসতে দিলে না?" উঠে দাঁড়িয়ে রেবতী বাবু উত্তর দিলেন,—"তোমার কোন চিন্তা নেই,—এক্ষুণি ওরা এসে পড়লো বলে। আমি এখন একটু উঠ্‌ছি। পারি তো সন্ধ্যার পর আসবো।" বলতে বলতে তিনি আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ রেবতী বাবুর পথের দিকে চেয়ে থেকে স্ত্রীকে সরোজ বাবু প্রশ্ন করলেন,—"এখন কটা বাজে লতু?—"

"—এইতো সবে চারটে বাজলো! তুমি অতো ব্যস্ত হ'চ্ছ কে'ন? রেবতী বাবু যখন বলে গেলেন তখন ওরাও নিশ্চয়ই আসবে"। তারপর একটু ভেবে বললেন—"কিন্তু কি আশ্চর্য্য দেখেছ? ক্ষীরোদের মনে তোমার সম্বন্ধে কোন দাগ পর্যন্ত পড়েনি। অভিমান ওর নেই; ছেলেটা চিরকালই কেমন কাজ পাগলা আর নিরহঙ্কার জানতে তো? অথচ কত ভুলই না ভেবে মরেছি ওর সম্বন্ধে আমরা এতদিন!"

লতিকা দেবীর কথার উত্তর দেবার কথাই হয়তো সরোজবাবু ভাবছিলেন। এমনি সময় তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়িয়ে ডেকে উঠ্লো অরুণ—"দাদু আমি এসেছি।" তার পেছনেই দাঁড়িয়ে মিনা বুড়োর দিকে উদগ্রীব দৃষ্টি মেলে চেয়েছিল। আর মাধবী গিয়ে মায়ের পেছনে তাঁর কাঁধের ওপরে মাথা রেখে, পিতার রুগ্ন পাণ্ডুর মুখচ্ছবি দেখে আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছতে লাগলো।

অরুণের ডাক শুনে আনন্দের আতিশয্যে সরোজ চৌধুরী তখন, ত্রস্থ কম্পিত দুটী বাহু তার দিকে মেলে দিয়েই ডাকলেন—"এসো দাদু বুকে এসো"। বলেই তিনি জোর দিয়ে উঠে বসতে গিয়ে বিষম হাঁপিয়ে উঠলেন—। লতিকা দেবী তাড়াতাড়ি পেছন থেকে তাঁকে জড়িয়ে ধরতেই, মিনা অরুণকে তুলে খাটের উপরে উঠিয়ে তার দাদুর মুখের কাছে বসিয়ে দিল। সরোজ রায় হাত ইসারায় মিনাকে খোকার পেছনে বসতে বললেন।

অরুণের মাথাটা নিজের বুকের কাছে টেনে নিতে নিতে সরোজবাবু বললেন—"তোমায় আমি আর কোথাও যেতে দেবো না দাদু!" তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, "কালকেই আসবো বলে তুমি সেই যে পালিয়ে গেলে, একবারটি আর তোমার মনে পড়লো না দাদু-দিদির কথা? আমি তোমার জন্য কতো খেলনা,—আরো কতো কিছু আনিয়ে রেখেছি। কত লোক এলো গে'ল, আমি বল্লুম তাঁদের তোমার কথা। তাঁরা তোমার কবিতা শোনবার জন্য বসে রইল কতক্ষণ! তা তুমি তো কৈ এলে না? তাই তারা সবাই চলে গেল! আমি তোমার জন্য কত কেঁদেছি—তা তুমি জানো? এই দেখ আমার চোখের কোণে কালি পড়ে গেছে." বলেই বুড়ো তাঁর চোখের কোন দু'টো টেনে নাতিকে দেখালেন।

দুঃখ্যে এবং বালক-সুলভ লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে, কাঁদো কাঁদো মুখে, মায়ের দিকে একবার চেয়ে দেখে, অরুণ তার দাদুর গলাটা জড়িয়ে ধরে বললো, "আমি বাবাকে কত বলেছি তা তো তুমি জানো না? পিসিমাকে জিজ্ঞেস করে দে'খ, আমি কালও বলেছি ওঁকে, আমাকে এখানে নিয়ে আসতে। কিন্তু কেউ আমায় নিয়ে এলো না! আমি কি রকম কেঁদেছিলুম তুমি তো জানো না? তোমার বাড়ী যে কতদূরে, আমি কি করে ততদূরে একা একা পথ চিনে আসবো? তোমার মুখ দেখে আমার বড্ড কান্না পাচ্ছে! তু'ম তেমনি করে একটু হাস-না দাদু?"

মুখে কৃত্রিম হাসি ফুটিয়ে নাতির দিকে চেয়ে, সরোজ রায়

বললেন—"তুমি আর আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না ব'ল ? কোনদিন আমাকে ছেড়ে থাকবে না ?" অরুণ মাথা দোলাতেই ভৃত্যের উদ্দেশ্যে হাঁক দিয়ে তিনি বললেন—"ওরে কে আ'ছস ? খোকার সেই জিনিষগুলো সব নিয়ে আয় তো !" আরদালীর মত পোষাকে সুসজ্জিত একজন ভৃত্য তখন সরোজবাবুর খাটের নীচে থেকে, খোলা মেজের ওপরে টেনে বের করলো,—একটা ট্রাই সাইকেল ! একটা ফুটবল ; ব্যাটবল খেলবার সরঞ্জামের সঙ্গে হু'খানি ব্যাট। হু'খানি ছোট্ট টেনিস র‍্যাকেট সমেত—টাঙ্গিয়ে খেলবার একটি রঙ্গীন জাল। একটা পিং-পং বাজনা। ছোট্ট একটি অভিধান। একটা চকচকে রূপোয় বাঁধানো বাঁশী। হু'খানা বড় বড় ছেলেদের পড়বার বিলিতি ছবির বই, আর—সেই সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে,—পরে খেলবার রকমারী পোষাক ও জুতো।

পাশের ঘর থেকে লতিকা দেবী নিয়ে এলেন একটা মরক্কো লেদারের ছোট্ট সুন্দর সুটকেশ ! তার ভেতর থেকে বের করলেন সুন্দর একসেট বিলিতি ছবির বই। একসেট সুন্দর বাঁধানো খাতা। একডজন নানা জাতীয় পেনসিল। একটা চকচকে রূপোর ঢাক্‌নি দেওয়া কাঁচের দোয়াত। একখানা নয়নাভিরাম ব্লটীং প্রেসার। ছোট্ট ছোট্ট কয়েকটা পেপার ওয়েট। ড্রইং আঁকবার বিলিতি ধরণের নানাজাতীয় স্কেলের একটী বাক্স। ওয়ার্ড মেকিং তৈরীর এক বাক্স সেলুলয়েডের ইংরেজী অক্ষর। আর একটা বাক্স ভর্ত্তি কতকগুলো হাল্‌কা কাঠের ওপরে আঁকা রকমারি, টুকরো টুকরো ঘরবাড়ী আর সিন সিনারীও তৈরী

করবার রঙিন কাঠের খেল্‌না। তার সঙ্গে রয়েছে,—রঙিন বাড়ী ঘর, নদী, পাহাড় আঁকা একটা সুন্দর ছবির বই !

অরুণ এত সব জিনিষ জীবনেও এক সঙ্গে চোখে দেখেনি,—কোন্‌টা দিয়ে যে কি খেলতে হয়, তাও তার ভালো করে জানা নেই। কিন্তু জিনিষগুলো তখন সে যদি পায় তবে যেন সে তক্ষুনি খেলতে সুরু করে দেয়, এমনি উদগ্রীব ললুপ দৃষ্টি মেলে অরুণ তখন একবার দাহুর দিকে আর একবার জিনিষগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ছিল।

টয়েজ-মেকিংএর বাক্সটা খুলে, রঙ্গিন কাঠের টুকরোগুলো দিয়ে, বিছানার ওপরে বই দেখে দেখে একটা বাড়ী তৈরী করতে করতে সরোজবাবু ব'লে ওঠেন—"এমনি করে সব তৈরী করতে হয়। বুদ্ধিমান ছেলেরা এ সব ভারি চটপট তৈরী করে ফেলতে পারে ! তৈরী কর দেখি ঐ রঙিন কাঠের টুকরোগুলো দিয়ে এই ছবিটার মতো একটা বাড়ী— ! তা হলেই এ সব তোমার !" বলেই বুড়ো খোকার মুখের দিকে চেয়ে হাসতে লাগলেন।

মুখ শুকিয়ে অরুণ তাড়াতাড়ি দাহুর মুখের দিকে চেয়ে ব'লে ওঠে,—"আর আমি তৈরী করতে না পারলে তবে এ সব কাকে দিয়ে দেবে ?"

"তোমাকেই তো সব দিয়েছি ! সেদিন যে বলেছিলে তুমি খুব বুদ্ধিমান, রবিঠাকুরের কবিতা বলতে পারো, ইংরেজী বই পড়ো ? তার চেয়ে এ তো ঢের সোজা কাজ। ছবির সঙ্গে

মিলিয়ে একটা আগে তৈরী করেই ফে'ল না ? না পারলে তখন আমি দেখিয়ে দেবো।"

বালক অরুণের আনন্দ তখন আর ধরে না। এত সব খেলনা, এত সুন্দর সুন্দর জিনিষ, সবই তার দাদু তাকে দিয়ে দিয়েছে ? মন্দ ছেলেদের বুঝি কোন দাদুই এত সব জিনিষ দেয় না ? মনে মনে খুব ভালো ছেলে হবার একটা শিশু সুলভ প্রবৃত্তি নিয়ে ভারী গম্ভীর সম্ভার ভাবে ট্রাইসাইকেল-টার দিকে দেখিয়ে অরুণ তার দাদুকে বলে উঠলো,—"আমি কত তাড়াতাড়ি চালাতে পারি ঐটেতে চড়ে তোমায় তাই আগে একবার দেখিয়ে দেবো ?"

খুশীর উচ্ছ্বাসে বালিশ জড়িয়ে ধরে, উঠে বসতে বসতে সরোজ রায় বললেন,—"যাও দেখি, উঠে কেমন চালাতে পারো দেখি ? অরুণ তখন নিজের ভেতরে এক বিরাট কৃতিত্বের স্বর্গ রচনা করে ফেলেছে। দাদুর কথায়,—একলাফে গিয়ে সে ট্রাই-সাইকেল-টাতে উঠে বসেই চালাতে সুরু করলো। বুড়োর আনন্দ তখন আর ধরে না। তার ঐটুকু নাতি এ'ত সব পারে ? পয়সা স্বার্থক হয়েছে খোকাকে জিনিষগুলো কিনে দিয়ে।

নিজের একমাত্র পুত্রের প্রতি পিতার এই অপারসীম বাৎসল্য দেখে মাধবীর দুটি চক্ষু বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পরতে লাগলো। তার মনে অনুশোচনা এলো—অরুণকে তার বাবার কাছে ইতিপূর্ব্বে পাঠায় নি বলে। সুন্দর রঙিন গালচা পাতা হল ঘরটার ভেতরে অরুণ যখন সাইকেল চালিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল

তখন সরোজ রায় যেন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ভুলে গেছেন। তাঁর ইচ্ছে, তক্ষুনি উঠে গিয়ে তিনি যদি অরুণের সঙ্গে নীচের মাঠটায় খেলা করতে পারতেন, তা হলে হয়তো তাঁর নাতি আরো খুশী হতো!

লতিকা দেবী দু'তিনবার স্বামীকে স্মরণ করিয়ে দিলেন মিনা আব মাধবীর কথা, কিন্তু তাদের দিকে সরোজ রায় ফিরে চাইবার পর্যন্ত অবকাশ পেলেন না। তারপর এক সময়ে অত্যধিক আনন্দের উত্তেজনায়, একেবারে তিনি বিছানা জুড়ে হাত পা ছড়িয়ে এলিয়ে পড়লেন। অরুণ তখন সাইকেলে চড়ে বাইরের বড় গাড়ীবারান্দাটার ওপাশে লুকিয়ে পড়েছে। ব্যস্ত সমস্ত হয়ে,—মাধবী, লতিকা দেবী, আর মিনা,—সরোজ রায়ের মুখের ওপরে ঝুঁকে পড়ে' দেখলেন,—প্রাণপণে নিশ্বাস টানছেন সরোজবাবু।

লতিকার ইশারায় ডাক্তার আর নার্স ছুটে এলো। মিনা তৎক্ষণাৎ নীচে ছুটে গেলো,—সরোজ-সেবা সদনে ক্ষীরোদ ডাক্তারকে আর বিলাসকে তার অফিসে টেলিফোন করবার জন্য বাড়ীময় তখন হুলুস্থুল ব্যাপার পড়ে গেছে।

দাতুর এই অবস্থা দেখে অরুণ পাছে ভয় পায় কিম্বা কেঁদে ওঠে, সেই আশঙ্কায় লতিকা দেবী একটা বেয়ারাকে দিয়ে খোকাকে বাড়ীর মাঠে নিয়ে গিয়ে খেলা করবার নির্দ্দেশ দিলেন।

টেলিফোন করা শেষ হলে, মিনা তাড়াতাড়ি ওপড়ে উঠে সরোজ রায়ের বুক পরিক্ষা, এবং গায়ের উত্তাপ নেবার কাজে

ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লো। এমনি সময়ে হন্তদন্ত হয়ে ক্ষীরোদ ছুটে এসেই গরম জলের খোঁজ করে, পিতার বুক পরিক্ষা করতে সুরু করে, মা এবং বোনকে পাশের ঘরে চলে যেতে বললো। তাঁরা সরে যেতেই, ডাক্তার পাল, ছু'জন ছাত্র ডাক্তারের সাহায্যে একটা গ্যাস দেবার যন্ত্র এনে ঘরের একপাশে রাখলেন। গরম জলের ভেতরে কি একটা ঔষধের মত বস্তু গুলে যেন ডাঃ পাল সরোজ বাবুর মুখে ছোট চামচের সাহায্যে পান করিয়ে দিয়ে, তক্ষুণি নীচে নেমে গেলেন।

মাথার পাশ থেকে মিনা, আর বুকের পাশ থেকে ক্ষীরোদ তখন, – সন্দিগ্ধ, উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি মেলে সরোজবাবুর দিকে চেয়েছিল। সহসা সরোজবাবু ছু'চোখ মেলেই ডাকলেন— 'লতু'। তারপর ক্ষীরোদের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। ডাক শুনে, মায়ের পেছনে পেছনে মাধবীও এসে সরোজবাবুর মুখের উপড়ে ঝুঁকে পড়লো।

অতি কষ্টে, ক্লান্ত কম্পিত ছুটী বাহু দিয়ে সরোজ রায়, ক্ষীরোদ আর মিনার ছু'খানি হাত সংগ্রহ করে, নিজের দিকে টেনে নিতে নিতে, লতিকার দিকে চেয়ে বললেন,—"তোমায় দি-য়ে গে-লা-ম!"…

একজন নার্সের নির্দ্দেশে মেনকা ইতিমধ্যেই কিছুটা গরম ছুধের সঙ্গে খানিকটা ভাইনাম্‌-গ্যালোসিয়া মিশিয়ে এনেছিল। তার হাত থেকে সেটা নিয়ে, বিশুষ্ক মুখে ক্ষীরোদের দিকে চেয়ে, লতিকা বললেন—"এটা খাইয়ে দেবো?" সরোজবাবুর শুষ্ক

পাণ্ডুর ঠোঁট তু'খানা তখন কেঁপে কেঁপে উঠছিল। সেইদিকে লক্ষ্য করে ক্ষীরোদ বোল্লো,—"দিতে পারো,—খুব অল্প করে"। কিন্তু চামচে করে তাই একটু সরোজ বাবুর মুখে ঢালতে গিয়ে লতিকা দেবীর হাতটা কেমন যেন কেঁপে উঠলো; আর অমনি ঝপ্ করে অনেকটা তুধ তাঁর মুখে পড়ে গেল।

হঠাৎ একটা বিকট ঘর ঘর শব্দ বেজে উঠ্লো সরোজবাবুর কণ্ঠ থেকে!

পিতার হাতের পাল্স্টা দেখেই ক্ষীরোদ একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বিছানায় বসে পড়লো। লতিকা দেবী তখন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।

পিতার মৃত্যু মলিন মুখের দিকে সজল নয়নে চেয়ে, মাধবীর মনে যেন ঝড়ের দোলা বয়ে যেতে লাগলো। এক সময়ে তার মনে প্রশ্ন জাগলো,—চলতি জীবনের এই বিক্ষিপ্ত সংগ্রামে,—জয়ী হ'ল তার ভ্রাতা, না তার স্বামী বিলাস? মাধবীর আঁখি পল্লবে বড় বড় তু'ফোঁটা জল তখন মেঝেতে আছাড় খেয়ে পড়বার জন্য টলমল করছিল।

*　　*　　*

সংবাদ পত্রের অফিস থেকে বিলাস যখন শ্বশুরবাড়ী অভিমুখে যাত্রা করবার জন্য পথের তীরে এসে দাঁড়ালো তখন সমস্ত আকাশ খানা ঘনঘটাচ্ছন্ন রক্তিম মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। হাত ঘড়িটার দিকে নজর দিয়ে সে যেন চম্‌কে উঠলো,

—সর্ব্বনাশ! সাতটা যে বাজে? আর তার বিলম্ব করবার সময় নেই। টেলিফোনে সে মিনাকে কথা দিয়েছে, সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার ভেতরেই সেখানে গিয়ে সে নিশ্চয় পৌঁছুবে!

পথে নেমে বিলাস দেখলো,—আশে পাশে কোথাও যান-বাহন কিম্বা পথচারীর চিহ্ন পর্যন্ত নেই। খানিকটা পথ যেতেই দমকা ঝড়ের সঙ্গে হু-হু শব্দে বাদলের মাতামাতি সুরু হয়ে গেল। সেই দুর্য্যোগের মধ্য দিয়েই—বিলাস তার গন্তব্য স্থল অভিমুখে চলতে লাগলো,—ঠিক যেন, সংকল্পে অটল দিক্‌বিজয়ী বীর সৈনিকের মতো।

—শেষ—

—শ্রীযতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের অন্যান্য বই—

কালের যাত্রা

বেদনা মধুর কয়েকটি মর্ম্মস্পর্শী গল্পের সংগ্রহ।

(দাম—দেড় টাকা)

প্রবাসী, আনন্দবাজার, যুগান্তর, বসুমতী,

প্রভৃতি পত্র ও পত্রিকার দ্বারা উচ্চ প্রশংসিত।

* * * *

দশাননের গল্প

দশটি হাস্য-রসাত্মক গল্প-সংগ্রহ।

(দাম—দুই টাকা)

'প্রবাসী' বলেন—"দশাননের গল্পে উচ্ছল আনন্দের রস আছে, মর্ম্মস্পর্শী রোমান্স্ আছে, আর আছে অবকাশের মুহূর্ত্তগুলি কাটাবার অফুরন্ত মনের খোরাক"—

'যুগান্তর' বলেন—"দশাননের গল্প বলিবার একটি নিজস্ব ভঙ্গি আছে। ভাব ও ভাষার সাবলীলতায় প্রত্যেকটি গল্পই প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে……"

'দেশ' বলেন—"গল্পগুলিতে নানা দিক দিয়া বৈশিষ্ট্য আছে। যে সকল সমস্যা ও ঘটনা আমাদের আশে পাশে অতি সহজ ভাবে জমিয়া আছে, লেখক তাহা হইতেই বিষয়-বস্তু গ্রহন করিয়াছেন এবং অতি সহজ অনাড়ম্বর ভাবেই তাহা বিবৃত করিয়াছেন। রচনার মধ্যে প্রচ্ছন্ন বেদনা মিশ্রিত বিদ্রূপ, পাঠকের মনকে নাড়া দেয় ……পাঠ শেষে পাঠকের মনকে স্নিগ্ধ মধুর রসে প্লাবিত করে……"

* * *

যে কোনও পুস্তকালয়ে অনুসন্ধান করুন।